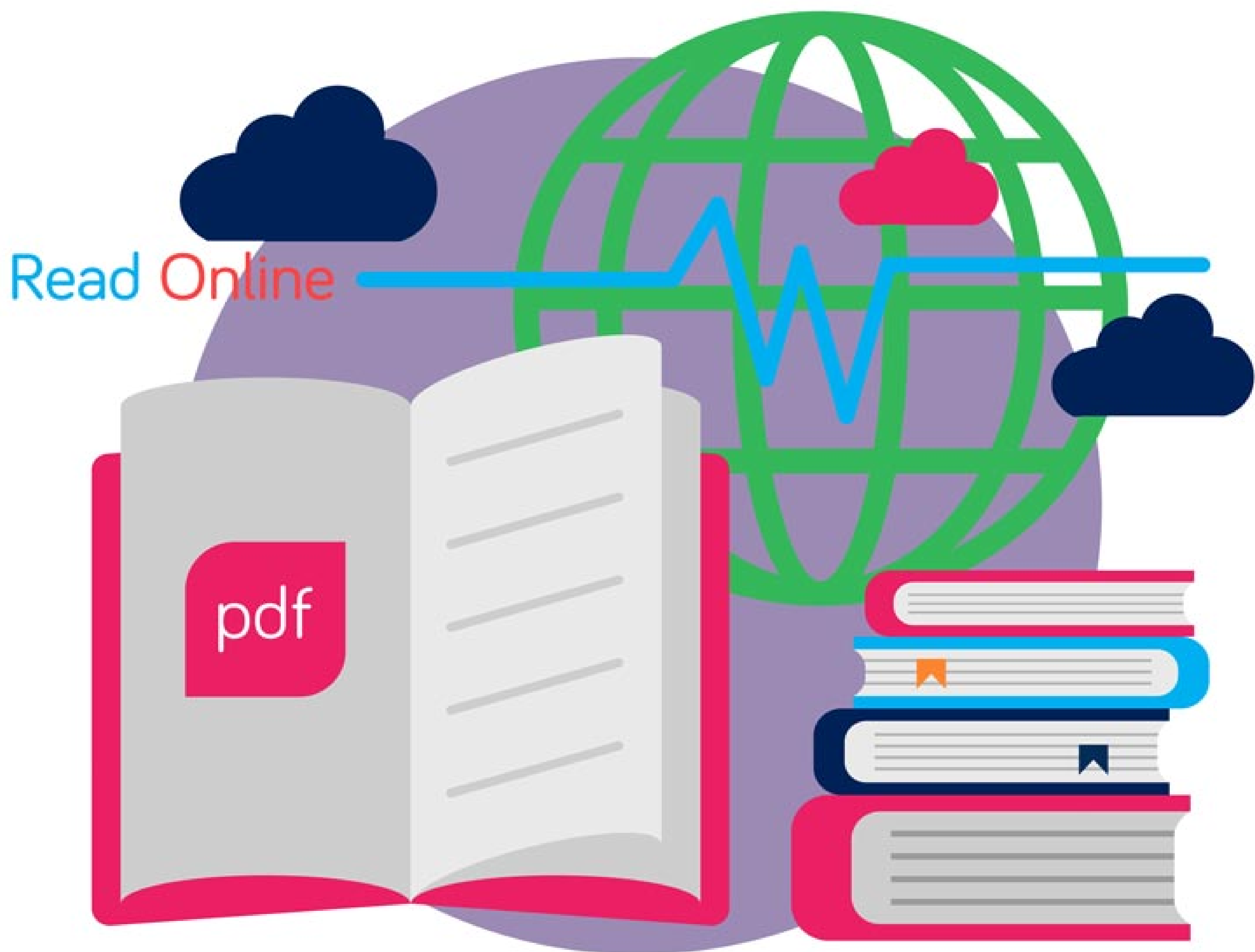
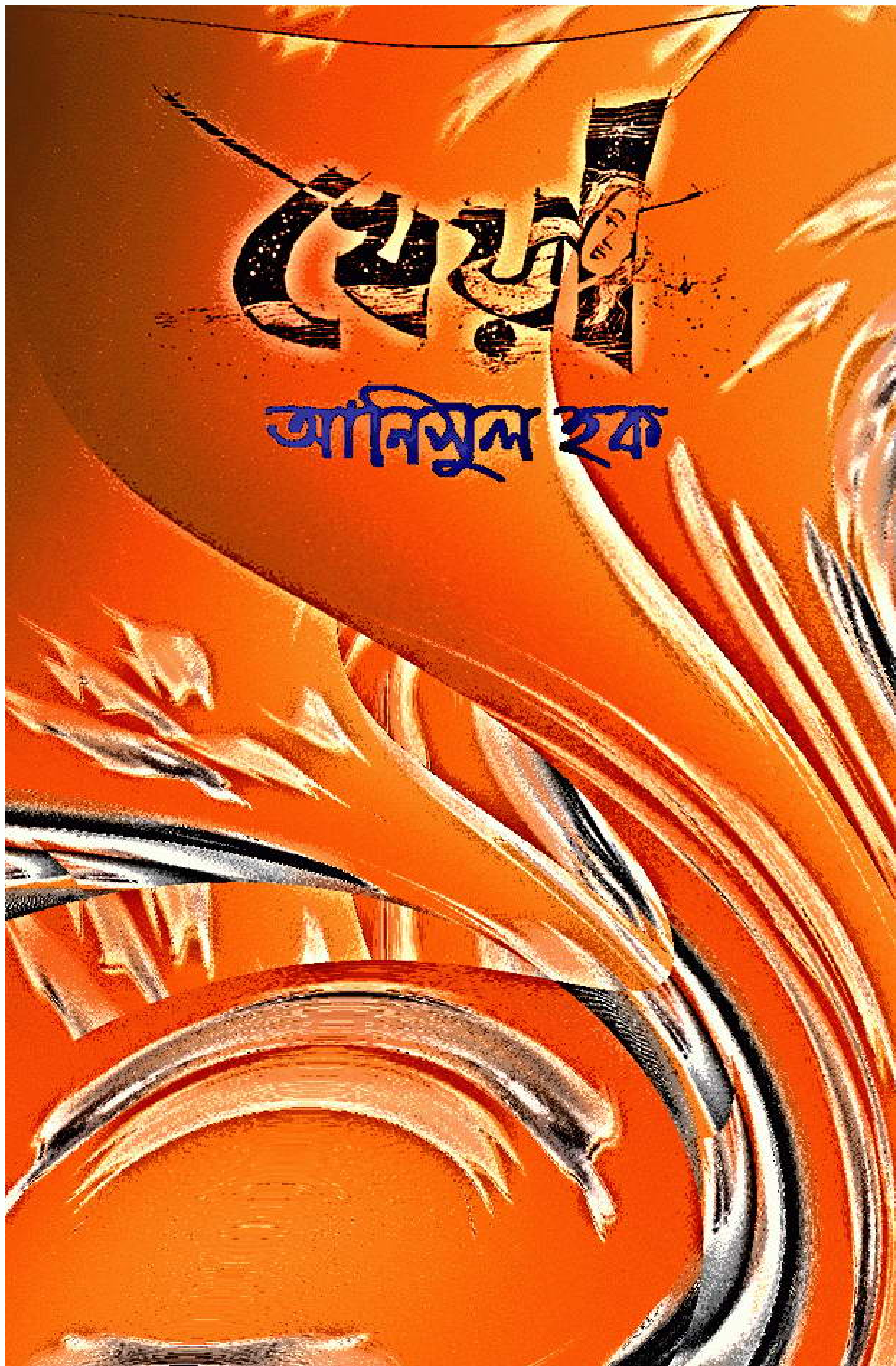
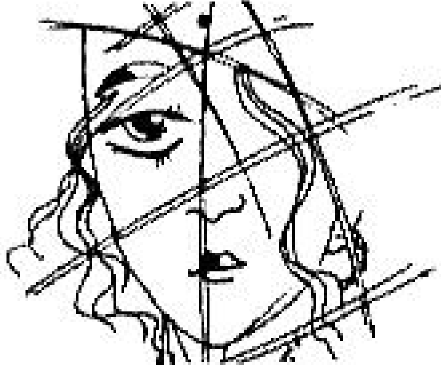


E-BOOK


আনিসুল হক

উৎসর্গ

আমি তখন পড়ি বুয়েটে, থাকি শহীদ স্মৃতি হলে; রংপুর থেকে এসেছি ঢাকায়; চারদিককে মনে হয় অনাত্মীয়; তখন পরিচয় একজন অগ্রজ কবির সঙ্গে; তিনি এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে; নিজের লেখা পদ্য হাতে নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হই রোজ রাতে; দু'তিন দিন ঘোরের মধ্যে থেকে লিখে ফেললাম *খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে;* তিনি বললেন, 'তুমি বই করতে পারো;' পদ্য বাছাই করে দিলেন; পাণ্ডুলিপি দেখে দিলেন; বই বের হলে লিখে দিলেন প্রশ্রয়পূর্ণ আবেগে উদ্বেল সমালোচনা। কী যে আনন্দ, কী যে কষ্ট, কী যে ভালোবাসার সেই সব দিন; কবিতার কামড়ে অস্থির, দিন বদলে দেবার অঙ্গীকারে উজ্জ্বল। সেই সব দিন হারিয়ে ফেলার জন্যে এখন কষ্ট হচ্ছে; মিনার ভাই, কবি মিনার মনসুর, আপনার হয় না?



এই গল্প ভালোবাসার, এই গল্প মধ্যবিত্তের। আমার প্রকাশকেরা প্রায়ই আফসোস করেন — আহা, আপনার গল্পগুলিতে যদি একটুখানি প্রেম-ভালোবাসা থাকতো! ভালোবাসার নামে কতো কিসিমের বইয়ে বাজার ঠাসা, যেমন ধরা যাক— ভালোবাসার দুঃখ, ভালোবাসার সুখ, ভালোবাসার কষ্ট, ভালোবাসার জোশ, ভালোবাসার পুলক, ভালোবাসার অশ্রু, ভালোবাসার আরাম, ভালোবাসার ব্যারাম, ভালোবাসার অসুখ; আছে রাতের ভালোবাসা, ভোরের ভালোবাসা, বিকেলের ভালোবাসা, প্রথম ভালোবাসা, শেষ ভালোবাসা। এই তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে যতো কাগজ লাগবে, তাতে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে, পুরোটা, কিংবা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে মওলানা মান্নান যেমনটা বলেছিলেন— যদি পৃথিবীর সব বৃক্ষ কেটে কলম বানানো যায়, আর পৃথিবীর সব সমুদ্রের পানিকে কালি, তবুও তাঁর গুণ লিখে শেষ করা যাবে না— বাজারে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার পুস্তকের নাম লিখতে গেলেও হবে সেই দশা। আর আছে মধ্যবিত্ত, ওই জীবনের রূপকথা, তাদের মেয়েরা হবে পরীর মতো ধবধবে সাদা আর রূপবতী, আর কী যে মায়াবতী, তারা যখন হালকা গোলাপি রঙের স্যালোয়ারটা একটু উপরে তুলে সুডৌল পায়ের খানিকটা বের করে সবুজ দূর্বা ঘাসে পা রাখবে, টলমল শিশিরে জাগবে সির সির প্রশ্রয়, কী গোলাপি কী ফর্সা কী টিউবলাইটের মতো পা দুটো; পাঠকের মনে হবে, মনে হবে লেখকেরও যে- ও মেয়ে ও চলমান স্নিগ্ধতা, ও শুভ্র পবিত্রতা, তুমি তোমার পা দুখানি আমার দুই করতলে রাখো, ওই দুটি তো পা নয় আরাধ্যা বালিকা, ওই দুটি চরণ, তোমার রক্তকমল শ্বেতপদ্ম চরণদ্বয় আমার বুকের ওপরে রাখো, আমি বেঁচে উঠি, আমি মরে যাই।

এইবার সেই রূপকথার গল্প, দুঃখবিনাশী ভালোবাসা, স্বপ্নভুক মধ্যবিত্তের হাসিকান্নার বাজার মন্থনকরা গল্প লিখিত হচ্ছে।

নিজের কাছে ক্রমাগত পেশ করা নিজেরই বুঝ—ক্ষমতার চক্র থেকে বের হয়ে কোনোদিনও মুক্ত হতে পারবে না মানুষ, তবু প্রকৃত প্রগতিশীলের কাজ ক্ষমতার বৈধতাকে ক্রমাগত আক্রমণ করে যাওয়া, যেমন বলেছিলেন মিশেল ফুকো কিংবা এখন এ সমাজকে নিয়ে আর কিছুই করবার নেই, কেবল বিদ্রূপ করা ছাড়া, যেমনটি বলেছিলেন ব্রেশট—তা আপাততঃ ধামাচাপা কিংবা গামলাচাপা দেয়া ভালো। আমাদের

সুনীতির গল্পগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকুক পুস্তকের পাতায়, আর আমাদের বাস্তবতাগুলো ঝমঝমিয়ে রমরমিয়ে উঠুক আপোসের চিকন সম্মোহনে। আহ্ মধ্যবিত্ত!

মধ্যবিত্তের ভালোবাসাবাসির এই গল্পগুলোয় কী থাকতে হয়? একজন বাবা থাকেন, তিনি একই সঙ্গে আবদ্ধ থাকেন বাস্তব জীবনের কঠিন কাঁটাতারে, একদিকে; অন্যদিকে তার অন্তর থাকে মুক্ত, তার হৃদয় জুড়ে বেজে চলে বন্যার কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত--- দূরে কোথায় দূরে আমার মন বেড়ায় ঘুরে। উৎকাঙ্ক্ষা।

আমাদের গল্পের এই পিতাটির নাম আবিদুর রশিদ। এই নামেই তিনি এখন সর্বমহলে পরিচিত। তবে যদি কোনো অতিআগ্রহী তাঁর তোরঙ্গের নিচ থেকে উদ্ধার করতে পারেন তাঁর সনদপত্রসমূহ, দেখবেন সেগুলোয় তাঁর নাম আছে আব্দুর রশিদ সরকার। ছাত্রাবস্থার, যখন বৃক্ষ ছিলো সবুজ, আকাশ ছিলো নীল, মেঘ ছিলো শাদা, হৃদয় ছিলো পবিত্র, আবেগ ছিলো সজীব সতেজ, যখন যে কোন বালিকা মুখ তুলে চোখ মেলে চাইলে আকাশ থেকে ঝরতো এক কোটি নক্ষত্র, তখন অন্য যে কোনো বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো তার ভেতরেও উদ্গত হয় কবিতা; এবং বৈশাখের সহস্র আম্র মুকলের মতো ঝরে না পড়ে সফল হবার বাসনাও তার মধ্যে কিছুকাল স্থায়ী থাকে। ফলে কবি হবার সংগ্রামের প্রথম কর্তব্য হিসেবে নির্মোহভাবে নিজের নামটিকে করে তোলেন কাব্যোচিত, আব্দুর রশিদ সরকার হয়ে ওঠে আবিদুর রশিদ। বাঙালি মধ্যবিত্তকে সর্বদাই পিছে টানে গ্রাম, পিছে টানে ভূমি, টেনে ধরতে চায় কৃষকতা— নিজের নামটিকে পরিপাটি করার এই পর্বটি তাই এক অর্থে প্রতীকী, যেন এর দ্বারাই আবিদুর রশিদ ঘোষণা করে দিতে সমর্থ হন যে—তিনি আর ফিরে যাচ্ছেন না গ্রামে, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাতকানি গ্রামটিতে।

আজ সকালবেলা, ঘুম থেকে উঠে আবিদুর রশিদ বারবার উঁকি ঝুঁকি করতে লাগলেন সামনে বারান্দায়, খবরের কাগজ দিয়েছে কিনা, সেটা দেখার জন্যে। খবরের কাগজ পাঠ তাঁর অন্যতম প্রাতঃকৃত্য; এটা তিনি করেন গভীর মনোযোগে এবং বেশ খানিকটা সময় নিয়ে। সংবাদপত্রের বহু বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও কৌতূহল, — হাসিনা-খালেদা সমঝোতা হলো কি হলো না, বসনিয়ায় সর্বশেষ যুদ্ধ পরিস্থিতি কোন দিকে গেলো, ডায়ানার বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য কিনা, এসব না পড়ে দিন শুরু করে শান্তি পান না। খবরের কাগজ না পড়লে মনে হয়, কোথায় যেন কী আটকে আছে, অনেকটা বাথরুম না হবার মতো।

কাগজ দিতে হকার যথারীতি দেরি করলো, তিনি ভাবলেন হয়তো আজ আর দেবেই না পেপার; তবে শেষ পর্যন্ত যে দিলো, এতেই তিনি খুশি। কাগজটা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে এলেন খাবার টেবিলে।

খবরের ভেতরে তিনি ডুবে গেলেন গভীরভাবে।

খুকু বললো, 'বাবা, আজ সকালবেলাতেই তোমার জন্যে অনেক সুখবর বেরিয়ে গেছে নাকি?'

খুকুর এই প্রশ্ন আবিদুর রশিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো বলে মনে হলো না। খুকু পত্রিকা ধরে টান দিলো, বললো, 'বাবা, আজকের কাগজে কি অনেক সুখবর?'

আবিদুর রশিদ মুখ তুলে চাইলেন, 'না মা, কাগজে কি আর সুখবর বেরোয় আজকাল? শুধুই দুঃসংবাদ! এই যে দ্যাখ, সরকারী - বিরোধী দলের সমঝোতাটা হচ্ছে না।'

'কেন বাবা দুঃসংবাদ কেন? আজ কি ঢাকা শহরে কেউ মারা যায়নি? সড়ক-দুর্ঘটনায়, পুলিশের গুলিতে, ডায়রিয়ায়, হতাশায়? এ ধরনের সুখবর একটিও নেই?'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'তা তো আছেই, মৃত্যুর খবর ছাড়া কি সংবাদপত্র হয়?'

খুকু বললো, 'তাহলে তো হলোই। তোমার দোকানের বিক্রি আজ বাড়বে বই কমবে না।'

মেয়ের এই রসিকতা আবিদুর রশিদের হজম করতে কষ্ট হলো। দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন তিনি।

আবিদুর রশিদ আবার খবরের কাগজে নিমগ্ন হলেন।

খুকু এবার লেগে পড়লো বাবুর পেছনে, 'এই বাবু, তুই চা খাচ্ছিস কেনরে, মা তুমি যে কিনা, ছোটোছেলেদের চা দাও।'

'আমি মোটেও ছোটো না আপা', বাবু চায়ের কাপ টেবিলে রেখে বললো।

খুকু চিৎকার করে উঠলো, 'মা, তুমি বাবুকে চা দিয়েছো, এটা কি ঠিক করেছো?'

রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলো মাঝবয়সী পরিচারিকা, মধ্যবিত্তগৃহের ও নাট্যসাহিত্যের অনিবার্য চরিত্র, সে এগিয়ে এলো, বললো, জী আপা, কাজটা আম্মা ঠিকই করছেন। চা খাইলে রং ফরসা হয়। এইজন্য বড়লোক মাইয়ারা ধবধবা ধলা।'

বাবু ও খুকু গেলো দাদির ঘরে। দাদিআম্মার বয়স আটষট্টি, তিনি গভীর মনোযোগে পড়ছেন মাসুদ রানা। এই বয়সে মাসুদ রানা পড়ে তিনি কী বোঝেন, এটা একটা রহস্যই বটে। খুকু সেই রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে চায়। তার সঙ্গী হলো ছোটো ভাই বাবু।

'দাদিআম্মা, ও দাদিআম্মা,' খুকু ডাকলো।

দাদি চোখ তুললেন না বই থেকে, এতোই মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন তিনি।

'দাদিআম্মা, এই যে আপনি এতো এতো মাসুদ রানা পড়েন, সব বোঝেন?'

'যা তো, পড়ার সময় ডিস্টার্ব করিস না। সোহানা এখন খুব বিপদে আছে।'

'কী যে বই আপনি পড়েন দাদিআম্মা, এই বইয়ে কি সবাই সব সময় বিপদে থাকে?'

'ওহ্ হো', দাদী তাকালেন মুখ তুলে, 'কী বলবি বল?'

বাবুকে আগে থেকেই শিখিয়ে দেয়া ছিলো। সে বললো, 'দাদিআম্মা, আমি একটা ছবি আঁকছি। সেটা দেখে তুমি বলে দাও ঠিক আছে না ভুল হচ্ছে।'

দাদি খানিক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখানে নিয়ে আয়।'

বাবু বললো, 'না, এখানে আনা যাবে না। রং কাঁচা আছে। আসোই না বাবা।'

বাবু দাদির হাত ধরে টানতে লাগলো, আর তাকে সমর্থন দিয়ে চললো খুকু, 'যাও না দাদিআম্মা, এতো করে বলছে।'

দাদি উঠলেন। পাশের ঘরে বাবু সত্যি সত্যি একটা ছবি আকঁছে। সেই ছবিটা দেখিয়ে সে বললো 'তোমাদের বাড়ি আঁকছি দাদিআম্মা। এই হলো তোমাদের ঘর, আর এই হলো দাদু। এটা তুমি। এখন বলো, দাদুর কি দাড়ি ছিলো, যখন তোমাদের বিয়ে হয়?"

দাদির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একদিন তাঁরও বিয়ে হয়েছিলো, অনেকদিন আগে, রাত্রিবেলা, কলাগাছ পুঁতে জলচকি বসিয়ে তৈরি হয়েছিলো শা'নজরের মঞ্চ, হ্যাজাক বাতি জ্বলছিলো আঙিনায় পোতা বাঁশের খুটিতে, আর কতো কতো পোকা উড়ে উড়ে আসছিলো বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড় থেকে, আঁচলের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হলো পাঞ্জাবির খুট, সেই আলোয় আয়নায় তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মুখ, তাঁকে দেখাচ্ছিলো শাহজাদার মতো।

'দাড়ি ছিলো না রে, মুখ ছিলো চাঁদের মতো পরিষ্কার'–দাদি বললেন, তার চোখের কোণে চিক চিক করে উঠলো অশ্রু।

এদিকে খুকু মাসুদ রানার বইটি বদলে দিয়েছে, দাদি পড়ছিলেন 'আমিই রানা', সেটা সে সরিয়ে রাখলো আলমারির ভেতরে, তার বদলে দাদির বিছানায় এনে রাখলো 'সেই উ সেন', শুধু পেজমার্কটা রাখলো আগের বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার মনে রেখে, পৃষ্ঠা ৯২/৯৩ এর মধ্যে। দাদি ফিরে এলেন, বাবু ও খুকু কক্ষ ত্যাগ করলো, তারা দাঁড়ালো দরজার চৌকাঠ ধরে, পর্দার আড়ালে; দাদি আম্মা যথারীতি ফিরে এসে মাসুদ রানা পড়তে লাগলেন।

অবলীলায় দাদি পড়ে চলেছেন, ৯৩ পৃষ্ঠা পড়ে চলে গেলেন ৯৪-এ, ৯৪ থেকে ৯৫-এ, খুকু আর বাবু খিলখিল করে হেসে উঠলো।

পর্দার আড়ালে আর কতোক্ষণ থাকা যায়, তারা ঢুকে পড়লো দাদির ঘরে, 'দাদিআম্মা ও দাদিআম্মা',

দাদি গম্ভীর, বললেন, 'আহা এখন যন্ত্রণা করবি না, রানা এখন খুব বিপদে আছে।'

খুকু ও বাবুর তখন হাসতে হাসতে দম ফেটে যাবার যোগাড়। খুকু বললো, 'দাদিআম্মা, তুমি এতোই মন দিয়ে পড়ো যে বুঝতেই পারো না, তোমার বইটা যে বদল হয়ে গেছে, তুমি যে বইটা পড়ছিলে, এটা তো সেই বইটা নয়।'

দাদিআম্মা তাকালেন ঘোলা চোখে, কারো কথাই এখন তার মাথায় ঢুকছে না, রানা আসলেই এখন খুব বিপন্ন।

খুকু ডাইনিং টেবিলে এসে দেখলো বাবা এখনো পত্রিকা নিয়েই পড়ে আছেন। বললো, 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি, তুমি কি মুখটা খানিক তুলবে।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'বল, শুনছি।'

'বাবা, তুমি কি হার্ট হয়েছো?'

'কেন?'

'ওই যে তোমাকে একটু আগে একটা বাজে কথা বললাম।'

'কোন্‌টা?'

'তোমার মনে নেই? তা হলে থাক। মনে না করিয়ে দেয়াই ভালো। বাবা, তোমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার কী বলো। আজ তোমাকে তাহলে সেই খাবারটা রেঁধে খাওয়াবো।'

আবিদুর রশিদ কিছু বললেন না। তাঁর এই মেয়েটিকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসেন। তাঁর মতো অকর্মণ্য মানুষের ঘরে এই মেয়ে, যেন গোবরে পদ্মফুল। হাসনা অবশ্য বলে, এ হলো ভালো মানুষির পুরস্কার। স্ত্রীর চোখে স্বামীরা সাধারণতঃ হয় বলদ শ্রেণীর, কিন্তু হাসনা ব্যতিক্রম, তাঁর এই বলদবেচারা ভাবকে সে বলে ভালোমানুষি।

খুকুও আর বাবাকে ঘাঁটালো না। সে সব সময় কথা বলে বেশি। বেশি কথা বললে মাঝে মধ্যে বিপদ হয়, আজ কোনো মতে বেঁচে গেছে। তাঁর বাবার সবচেয়ে দুর্বল ক্ষতস্থানে সে খোঁচা দিয়ে ফেলেছিলো। বাবা সম্ভবতঃ টের পাননি। তাঁর বাবার ব্যবসাটা খুবই নাজুক জিনিসের। বাবার একটা দোকান আছে, নাম 'পারাপার স্টোর'। সেই দোকানে বিক্রি হয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক যাবতীয় জিনিসপত্র, কাফনের কাপড়, লোবানকাঠি, তেজপাতা, কফিন ইত্যাদি। বাবা এমন উদ্যোগী নন যে দোকানটিতে গিয়ে বসবেন, দোকানের উন্নতি করার চেষ্টা করবেন; আবার একটা নতুন ব্যবসায় নেমে পড়বেন— সেই কর্মোদ্যমও তার নেই। আজ সকালে খুকু সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে ফেলেছে বাবাকে, কাগজে মৃত্যুর খবর দেখলে বাবা খুশি হন— এমন একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত সে দিয়ে ফেলেছে তাঁকে। এটা তার মোটেও উচিত হয়নি। তার বাবা কতো ভালো। বাবাকে সে কোনোদিন রাগতে দেখেনি, কোনোদিন হাত তোলা তো দূরের কথা, গলার স্বর উঁচু করে কথা বলেন না পর্যন্ত।

প্রিয় পাঠক, আমরা আমাদের গল্পের আরম্ভটা করে ফেলতে পেরেছি, একেবারেই উপযুক্ত একটি পিতৃচরিত্র এখন নির্মীয়মাণ, যিনি তার ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত স্নেহ

করেন, যাঁর মতো ভালোমানুষ এই জগতে সম্ভবতঃ আর দ্বিতীয়টা নেই; অথচ যার বাণিজ্যটা একটু খটোমটো প্রকৃতির— পারাপার স্টোর। তাঁর এই দোকানটায় আপনাদের আমি নিয়ে যাবো, আপাততঃ খুকু চরিত্রটা সম্পর্কে আরো খানিক বর্ণনা দিই। খুকুর বয়স আঠারো, সে হলিক্রস কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেছে, মেধাবী এই মেয়েটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেশ ভালো। খুকু দেখতেও হয়েছে সুশ্রী, কেবল চোয়াল দুটো খানিক উঁচু বলে তাকে লাগে থাই মেয়েদের মতো। সে যখন তার চিকন কালো ফ্রেমের চশমা পরে বাইরে বেরোয়, তাকে লাগে ঠিক যেন টেলিভিশনে চশমার বিজ্ঞাপনের মডেল। স্বভাবে সে ছটফটে, দারুণ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত।

আর ভীষণ মায়াবতী। প্রিয় পাঠক, প্রকাশকের অনুরোধে এই গল্প, মধ্যবিত্তের আর ভালোবাসার; সুতরাং এখন আমাদের এই বালিকা কিশোরী মায়াবিনী চরিত্রটি কাঁদতে বসবে। আমরা যদি এখন খুকুর ঘরে যাই, দেখবো, বিছানায় উপুড় হয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে। সকালবেলা কেন বাবাকে এভাবে দুঃখ দিলাম— কান্নার সূত্র এটাই।

বেশি কথা বলা মোটেই উচিত নয়, খুকু ভাবছে, বেশি কথা বলে আমি বহুবার ধরা খেয়েছি, একেবারে প্রাণঘাতী ধরা।

সে দিন পাশের বাসার হেলেনা খালার বাসায় গিয়ে তাদের নবজাত নাতনিটিকে দেখে খুকু বলেছে, বাহ, এ যে দেবশিশু, এতো সুন্দর? অম্নি খালা বাচ্চার গায়ে থুতু ছিটিয়ে বলেছেন, বালাই ষাট। পরে বাচ্চাটির যখন তিনদিনের জ্বর গেছে, তখন হেলেনা খালা সবাইকে বলেছেন, 'ও বাড়ির খুকুর নজর খুব খারাপ।'

এইতো পরশু দিনের ঘটনা। ওর বন্ধু স্বাতীর সঙ্গে গেছে স্বাতীর ফুপুর বাসায়। খুকুর খুব তাড়া ছিলো। চা আর পাটিশাপটা পিঠা খাবার পরপরই উঠতে হচ্ছিলো তাদের। খুকু বললো, 'ফুপু আম্মা, এবার আমাকে একটু নোয়াখালি হতে হয়।'

ফুপু বললেন, 'এ কথার মানে কী?'

খুকু বললো, 'মানে খাওয়ার পর পরই ছুটতে হচ্ছে তো, তাই বললাম আর কী? নোয়াখালির লোকের মতো।'

ফুপু ফিচ্ করে কেঁদে ফেললেন। 'জেনেশুনে তুমি এমন কথা বলতে পারলে।'

স্বাতী চিমটি দিলো খুকুর হাতে, 'চুপচুপ, ফুপার বাড়ি নোয়াখালি। এই নিয়ে ফুপু আজ ১৫ বছর ধরে কান্নাকাটি করেন। তুই ফুপুর সেই দুঃখ উথলে দিলি।'

খুকু তো এই পৃথিবীতে কাউকে দুঃখ দিতে চায় না, আঘাত দিতে চায় না। আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও আঘাত না লাগে। আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।



আবিদুর রশিদ বললেন, 'খুকুর মা, আমি বের হচ্ছি। যাই দেখি, দোকানে বেচাবিক্রির কী অবস্থা। টাকা-পয়সা পেলে একেবারে ফিরবো বাজার করেই। দুটো পলিথিনের ব্যাগ দাও।'

হাসনা বেগম পলিথিনের দুটো ব্যাগ এগিয়ে দিলেন স্বামীকে। তিনি সে দুটো পুরলেন পাঞ্জাবীর পকেটে।

'তাড়াতাড়ি ফিরো, আজ কিন্তু দুপুরে খাওয়ার কিছু নেই'— বললেন হাসনা বেগম।

আবিদুর রশিদ বেরিয়ে পড়লেন।

ভূতের গলি থেকে হাতিরপুল এসে দেখতে পেলেন— অসম্ভব ধরনের যানজট। যানবাহন তো নয়ই, কোনো মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয় এক চুল নড়া। তিনি হাতিরপুল মোড়ে খালেক সাহেবের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়লেন।

খালেক সাহেব বললেন,'বসেন।'

আবিদুর রশিদ নিঃশব্দে বসলেন চেয়ারে। তাকিয়ে রইলেন কাচঅলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে।

'আছেন কেমন?' খালেকের প্রশ্ন।

'জ্বী, ভালোই। দিন চলে যায়।'

'বাসার সবাই ভালো?'

'হ্যাঁ।'

'অসুখ বিসুখ নাই তো আল্লাহর ইচ্ছায়।'

'না, নাই।'

'তাহলে তো বেড়াতেই এসেছেন মনে হয়', খালেক বললেন। তার গলায় নিরুৎসাহের ছাপ, ওষুধ বিক্রির একটা সম্ভাবনা মিইয়ে গেলো বলে।

'বেড়াতেই মানে কী, আশ্রয় নিতে, কেমন জ্যাম দেখেছেন ?'

'দেখবো না মানে? ওই জ্যাম দেখেই তো সময় কাটাই। বেচাবিক্রি নাই। এই জ্যামের মধ্যে লোক আসবে কোত্থেকে? দেখেন, দেখেন, ওই রিকশাটায় দেখেন। পোলাপানের লজ্জা শরম নাই। এতোগুলা লোকের সামনে চুমা খাচ্ছে।'

'গতিময় ছবির দিকে চেয়ে থাকা যায়। যেমন ধরেন, আপনি ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের পানির দিকে তাকান। পানি বয়ে চলেছে। কতো কী যাচ্ছে। কচুরিপানা,

কলাগাছ, ডাবের খোসা— আপনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন। কিন্তু বদ্ধ পানির দিকে কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। কী বলেন?'

'না, রাস্তা চললেও ভালো লাগে। সবকিছু থামলেও দেখা যায়। দেখেন, ওই মহিলাটি, গাড়ির মধ্যে কেমন ঘামছে। পেছনের চাকা দেখেন, কতোটা দেবে গেছে। মহিলার ওজন কতো হবে বলেন তো।'

'কী যে বলেন?'

'এক টন হবে। কেমন করে বললাম বলেন তো। একটা ট্রাকে মাল ধরে পাঁচ টন। এমন মাল পাঁচটার বেশি একটা ট্রাকে উঠবে না।'

আবিদুর রশিদ রাস্তার দিকে তাকালেন, আব্দুল খালেকের ল্যাংগুয়েজ খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন যানজটের মধ্যে পড়ে ব্যবসা লাটে উঠলে মেজাজ ও ভাষার শরাফত রক্ষা করা কঠিন। এখনই ওঠা দরকার।

আব্দুল খালেক গলা খানিক খাদে নামিয়ে বললেন, 'ভালো টনিক আছে, নিয়ে যান, রাতে জোর পাবেন, আমি খাচ্ছি। অবস্থার এমন উন্নতি যে বউ বলে দিয়েছে, তুমি আরেকটা বিয়ে করো। আজ সকালে কাজের মেয়েকে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, ভীষণ সাবধানী মেয়ে। সাবধানের মার নাই ভেবেই সাত ঘাট বাঁধছে।'

আর বসাটা ঠিক হবে না। আবিদুর রশিদ উঠে পড়লেন। আজ পারাপার স্টোরে একবার না গেলেই নয়। কাল রাতে দোকানের কর্মচারী আব্দুল হাইয়ের বাসায় আসার কথা ছিলো, আসেনি। পকেটে টাকা পয়সা নেই বললেই চলে। তিনি অতিকষ্টে হাতিরপুল বাজার অতিক্রম করলেন। কাটাবন মসজিদের মোড় পেরিয়ে আর খানিকটা পথ গেলেই দোকান।

আবিদুর রশিদ কাটাবন মোড়ে এসে ভাবলেন, আর খানিকক্ষণ পরেই ও মুখো হওয়া যাক। ওই পথে যেতে তার মন সরে না। তার মনে হলো আজ সকালবেলার কথা। মেয়েটা তাকে একটা খোঁচা দিয়েছে। মেয়ে বড়ো হচ্ছে, বহু কিছু বুঝতে শিখছে, এখন অন্ততঃ তার উচিত এই ব্যবসা বদলানো। এবার ঠিক নতুন কিছু করবেন তিনি।

খালেক সাহেবের সঙ্গে হওয়া একটু আগের কথোপকথনগুলো তার মনে হলো। কতোদিন কাকচক্ষু স্নিগ্ধতোয়া জলধারা দেখেন না। রমনা পার্কের মধ্যখানের লেকটায় কি এখন পানি আছে? শীত শেষ হয়ে আসছে। এখন কি পানি শুকিয়ে যায়নি? ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। আবিদুর রশিদ পিজির সামনে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন রমনা পার্কের দিকে।

বাবু পড়ে ক্লাশ ফোরে, খুকুর আট বছরের ছোটো সে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে মাঝেমধ্যে বিপুল উৎসাহিত হয় এবং সিজন শেষ হয়ে গেলে সে বিষয়ে তার উৎসাহ ফুরিয়ে যায়, ইতিমধ্যেই সে আবিষ্কার করে ফেলে নতুন কোনো দ্বীপ। মাত্র

কিছুদিন আগে তার প্রবল মত্ততা ছিলো ডাক টিকেট সংগ্রহে; এখন সে লেগেছে একটা টিয়াপাখি নিয়ে। বারান্দায় টিয়াপাখিটা একটা খাঁচার ভেতরে রাখা, পয়ঁত্রিশ টাকা দিয়ে খুকু আর বাবু মিলে অপূর্ব পাখিটা কিনেছে মাত্র দু'দিন হলো।

বাবু এককাপ চা নিয়ে গেলো বারান্দায়। খাঁচার ভেতরে পানি রাখার ভান্ড, তাতে সে চা ঢাললো অতিকষ্টে, অর্ধেক চা কাপের গা বেয়ে পড়ে গেলো মেঝেয়।

পাখিটার নাম সে দিয়েছে মিঠু। এ নামটা তার দেয়া, তবে খুব মৌলিক কোনো অবদান এটা নয়, কারণ মিনা কার্টুনে রাজু আর মিনার টিয়ার নাম যে মিঠু, সে সেটা টিভিতে দেখে ও বইয়ে পড়ে জেনে ফেলেছে সুনিশ্চিতভাবে।

বাবু বললো, 'বলো, আমার নাম মিঠু। আমার নাম মিঠু।' এই ডায়লগটাও মিনা কার্টুনের, বাবু সংলাপটা ছবির সুরে সুর মিলিয়ে পুনঃপ্রয়োগ করলো মাত্র।

এবার বাবু তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করলো, বললো, 'মিঠু, তোমার রং কালো হয়ে যাচ্ছে। রং ফর্সা করা দরকার। তুমি চা খাও।'

বাবুর পাশে এসে দাঁড়ালো খুকু, 'এই বাবু , কী হচ্ছে?'

'মিঠুকে চা খাওয়াই'।

'মা, বাবা, দেখে যাও তোমাদের ইনোভেটিভ ছেলের কান্ড। মিঠুকে চা খাওয়াচ্ছে,' খুকু চিৎকার করে উঠলো।

বাবু বললো, 'দেখো না আপা, পাখিটার গায়ের রঙ কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে এক কাজ কর', খুকু বললো, 'আমার লিপস্টিকটা নিয়ে আয়, ওর ঠোঁট কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, ওকে লিপস্টিক দিয়ে দিই।'

'বারে, মিঠু তো ছেলে। ও কেন লিপস্টিক দেবে?'

'তাই নাকি, এটা ছেলে, তাও তুই জানিস নাকি? বাব্বা। তাহলে এক কাজ কর, বাবার শেভিং ক্রিম, রেজর নিয়ে আয়। মিঠুকে শেভ করিয়ে দেই। গাল ভর্তি দাড়ি। একদম ভ্যাবারাম লাগছে।'

'কী যে বলো না তুমি আপা?'

খুকু তাকালো বাবুর মুখের দিকে, তারপর অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলো, 'কী রে তোর নিজেরই একটু একটু দাড়ি হয়েছে মনে হচ্ছে।' গম্ভীরতা অবশ্য টিকলো না শেষতক, খিল খিল হাসিতে গলে গেলো গুরুভাব।

আবিদুর রশিদ হাজির হলেন বারান্দায়। বললেন, 'তোমাদের মিঠুর খবর কী? কথা বলা শিখেছে?'

খুকু বললো, 'না বাবা, মনে হয় একে মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে।' বলেই বুঝতে পারলো, কথাটা তেমন ভালো হলো না, বাবা মনে কষ্ট পেতে পারেন এ কথায়, বেশি কথা বলার এ হচ্ছে বিপদ। সামলে নিয়ে বললো, 'বাবা, আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম ৩০ দিনে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হয় গ্যারান্টি

সহকারে। এক হাজার টাকা ভর্তি ফি। বিফলে দশহাজার টাকা ফেরত। মিঠুকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসি। ওরা তো আর বলেনি পাখিকে ভর্তি করবে না।'

বাবু তখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মিঠুকে চা খাওয়ানোর। সে তার কর্তব্যে অটল থেকে বললো, 'বাবা, বাজার থেকে পাকা কাঁচা মরিচ এনো তো মিঠুর জন্যে।'

আবিদুর রশিদ হাসলেন— 'পাকা কাঁচা মরিচ মানে কী? এ যে দেখছি কাঁঠালের আমসত্ব।'

খুকু এবার কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলো— 'আরো আছে বাবা। সোনার পাথর বাটি। গরম কোল্ড ড্রিংকস। গরম হলে কোল্ড হয় কী করে? তেমনি হলো কাঁ আবার পাকা। মানে লাল রঙের কাঁচা মরিচ। পাকা কিন্তু শুকনো নয়। কাঁচা কিন্তু সবু নয়। বুঝেছো?'

আবিদুর রশিদ মেয়ের বুদ্ধিতে আবার মুগ্ধ হলেন, চমৎকার মেয়ে। মুগ্ধতা গোপ করে বললেন, 'ঠিক আছে এনে দেবো কাঁচা পাকা মরিচ। তোমাদের টিয়া আর ক খায়? ধান খায় না?'

খুকু বললো, 'খাবে না কেন বাবা! খায়। শোনো নাই কবিতা, বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, খুকু, ওটা তো ঘুঘু আর এটা তো টিয়া।'

আবিদুর রশিদ মেয়েকে প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'টিয়াও ধান খায়। তোদের এই খাঁচার টিয়া দেখলে আমার কিন্তু একটা কবিতা মনে পড়ে।'

বাবু বলে বসলো, 'আমারও। আয়রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে।'

খুকু বাবুর চুল টেনে ধরলো। 'চুপ কর না বাবা, বাবাকে বলতে দে।'

বাবু খুকু দুজনেই চুপ করে গেলো, নেমে এলো এক ধরনের নীরবতা; আবিদুর রশিদ পড়ে গেলেন অস্বস্তিতে, অনেকটা মঞ্চে কবিতা পড়ার মতো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবু নিতান্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে অসংকোচে তিনি বলে চললেন— দুইপাখি—

খাঁচার পাখি ছিল   সোনার খাঁচাটিতে
        বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া   মিলন হল দোঁহে
        কী ছিল   বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে   'খাঁচার পাখি ভাই-
        বনেতে যাই   দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখি বলে,   'বনের পাখি, আয়
        খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'

বনের পাখি বলে, 'না,
কবে খাঁচায় রুধি দেবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়'
মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

আবিদুর রশিদের কণ্ঠ ভালো, আবৃত্তি করলেন গভীর আবেগের সঙ্গে। বাবু চুপ হয়ে গেলো, খুকুর চোখ চিক চিক করে উঠলো জলে।

প্রিয় পাঠক, আমরা একটা বাজার চলতি গল্প লিখছি, এটাকে আমরা চালাবো উপন্যাস বলে, আমাদের গল্পের নায়িকা, যে রূপবতী ও মায়াবতী, সে হবে ছিচকাঁদুনে কথায় কথায় তার চোখ ভরে আসবে জলে, পৃথিবীর সর্বমানবের হয়ে সে দুঃখ পাবে, যেন সে কবি। তবে এই দৃশ্যটা আমরা নির্মাণ করেছি খুবই জরুরি একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করবো বলে।

খুকু বললো, 'বাবা, তোমার এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি, তুমি তো আবার বাংলায় মাষ্টার্স। বাবা, তুমি যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

আবিদুর রশিদ চুপ করে রইলেন।

'কী বাবা, তুমি কি পারমিশন দিচ্ছো?'

'হ্যাঁ, কী জিজ্ঞেস করবি, কর।'

'বাবা, আমি শুনেছি তুমি কবিতাও লিখতে। তোমার মতো একজন নিতান্তই ভালোমানুষ পারাপার স্টোরের মতো একটা অদ্ভুত ব্যবসা বেছে নিলো কেন?

আবিদুর রশিদের মুখ খুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি কথা বলতে লাগলেন অকপটে, ধীরে ধীরে, কিন্তু যুক্তি সাজিয়ে— 'পেশার আবার অদ্ভুত টদ্ভুত কী? ধর, ডাক্তার কী করে? অর্থের বিনিময়ে সেবা দেয়। একে আমরা বলি দুঃস্থ মানবতার সেবা। তারা তো ভিজিটের টাকাও নেয়, ওষুধের দাম নেয়। আর আমার দোকানটায় সার্ভিস দেয়া হয় মৃত্যুর পর। এও তো দুঃস্থ মানুষেরই সেবা।'

'তবুও বাবা, এমন একটা বিচিত্র ব্যবসার আইডিয়া তোমার মাথায় দিলো কে?'

'না না। এই আইডিয়া আমার মাথায় কখনো আসেনি। কেউ দেয়ও নি। দোকানটা ছিলো আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের। গাইবান্ধায় বাড়ি। আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন অন্য ব্যবসা করবেন বলে। সেই ব্যবসাটায় ভদ্রলোক পুরোটাই মার খান। টাকা আর শোধ দিতে পারলেন না। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কবিতা লিখেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো বলে ঠিক করে ফেলেছি। পেট চলে না। তোদের মাকে বিয়ে করে ফেলেছি। ভদ্রলোক বললেন, আমার একটা দোকান আছে। চালু দোকান, নিয়ে নেন। দোকান নেয়া মানে সপ্তাহ শেষে দোকানে গিয়ে টাকা আনা—এই কাজ। এর বেশি কিছু তো না। ভেবেছিলাম পজেশন তো থাকলো,

ব্যবসাটা পাল্টাবো। পাল্টাতে চাইলেই তো হবে না। উদ্যম দরকার। আমার সেই ব্যবসায়িক বুদ্ধিও নাই, পরিশ্রম করার শক্তিও নাই। রয়ে গেলো। মাঝখানে একটা ভালো ছেলে পেলাম। সোহাগ সে বললো, যে ব্যবসাই করি, সেটাকে মডার্ন করতে হবে। সেই ব্যবসাটাকে একটা মডার্ন রূপ দিয়েছে। দোকানটা সাজিয়েছে সুন্দর করে। ফোন রেখেছে। ছেলেটা বুদ্ধিমান, বলে, ঢাকার সবচেয়ে ধনী লোকদের টার্গেট করলে যে কোনো ব্যবসায় ভালো করা সম্ভব। যে ভাতের প্লেট দু'টাকা সেটার দাম দুশো টাকা করলেই কিছু খদ্দের পাওয়া যাবে আপনা আপনিই। পরে সেই ছেলেটা জাপান চলে গেলো। এখন বিজনেস মনে হয় তেমন ভালো না। চলে যাচ্ছে আর কী, কোনো মতে।'

পারাপার স্টোরে এখন কর্মচারী তিনজন। একজন আব্দুল হাই, বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ, গালে দাড়ি, মাথায় টুপি। আরেকজন গুল্লু মিয়া, বয়স ১০ কি ১২, তবে বয়সের তুলনায় শরীর বাড়েনি বলে তাকে আরো ছোটো দেখায়। তৃতীয় জন আসে রাতের শিফটে, দোকান খোলা থাকে ২৪ ঘন্টা। সকালবেলা আগরবাতি জ্বালিয়ে পিচ্চি গুল্লু মিয়া ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে। আগের রাতে বিক্রির হিসেবের খাতাটা দেখে আব্দুল হাই বললো, 'শীতকালের সিজনটা খুবই ডাল; আল্লাহ বিক্রিবাটা তেমন দেন নাই। আজও সেল নাই।'

রিকশা করে দোকানে হাজির হলেন আবিদুর রশিদ, এই সকালেই, গত সপ্তাহেও আসেন নি, টাকা-পয়সার অভাবে চুলোয় হাড়ি ওঠে কি ওঠে না অবস্থা গেছে, আজ এসেছেন অগত্যা, বাধ্য হয়ে। তিনি রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে এলেন, 'আব্দুল হাই, গেলো সপ্তাহের জমাটা দাও দেখি।

আব্দুল হাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'স্যার, আসেন স্যার, দোকানের ভিতরে এসে বসেন।'

'আজ আর বসি না। সামনের বৃহস্পতিবার এসে গেলো মাসের হিসাব নিয়ে বসবো।'

'আর হিসাব', আব্দুল হাই বললেন, 'দোকানে বিক্রিবাটা তো নাই স্যার।'

গুল্লু মিয়া দু'জনের কথার ভেতরে তার ছোট্ট আঙুল অযথা প্রবিষ্ট করে দিলো, 'ছার, আইজকা দুই শালিক দেখছি আহনের সুময়, আইজকা ছার বিক্রি হইবো হেভি।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'গুল্লু মিয়া, দুই শালিক হলো শুভ ব্যাপার, মঙ্গলের লক্ষণ। মানুষের মঙ্গল হবে। সবাই সুখে থাকবে, হাসবে, গাইবে। তার মধ্যে আবার মৃত্যুকে টেনে আনতে বলিস কেন।

এমন সময় আরেকটা রিকশা এসে দাঁড়ালো। একজন যুবক নামলো রিকশা থেকে, ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলো পারাপার স্টোরের দিকে।

গুল্লু পিচ্চি এগিয়ে গেলো, 'আসেন ভাইয়া আসেন।

আব্দুল হাই মুখটা করুণ করে বললো, ' ভাইজান কী চাইলেন?'

আগন্তুক কতোগুলি কাঠের তৈরি কফিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করলো,'এই বাক্সগুলো কী দর?'

আব্দুল হাই বললো, 'কোনটা নেবেন? কী সাইজ? বড়ো না ছোটো? নকশা করা না প্লেন?'

খদ্দের বললো, ' কোনটার কী দরকার। সবগুলোরই দাম বলেন।'

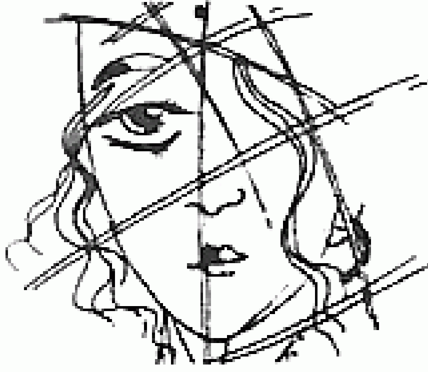
গুল্লু বললো, 'ভাইয়া! দর বুইঝা সাইজ নিলে তো চলবো না। মুর্দা যদি কম বয়সের হয়, কফিন লইতে হইবো ছোটো, আর মুর্দা যদি বড় হয়...

খদ্দের হেসে উঠলেন উচ্চৈস্বরে। হা হা হা হা হা হা। দীর্ঘ হাসি।

তার হাসি ভয় পাইয়ে দিলো আবিদুর রশিদ, আব্দুল হাই আর পিচ্চিকে। প্রিয়জন হারিয়ে ভদ্রলোক উন্মাদ হয়ে গেছেন নাকি?

'আরে না, মুর্দা টুর্দা না। হা হা হা, লেপ রাখবো, শীত শেষ হয়ে আসছে, লেপটা তুলে রাখা দরকার, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কাঠের বাক্স দেখে নেমে পড়লাম, আপনার এটা কফিনের দোকান নাকি, দেখে তো বোঝা যায় না, হা-হা-হা।'

যুবক বিদায় নিলো। আবিদুর রশিদের বুক থেকে নেমে গেলো ভারি পাথর। তিনি তাড়াতাড়ি করে খামবন্দি টাকা পাঞ্জাবির পকেটে পুরে এসে উঠলেন রিকশায়।



'মা, মা, আমার বুক কাঁপছে মা'—আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো খুকু; তার হাতে পত্রিকা।

মা ছিলেন রান্না ঘরে, ভয় পেয়ে ছুটে এলেন, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

কান্নার সুরে খুকু বললো,'বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্টের রেজাল্ট হয়েছে। আমার খুব ভয় লাগছে। আমি রেজাল্ট দেখতে বুয়েট পর্যন্ত যেতে পারবো না।'

ব্যাপার শুনে চিন্তামুক্ত হলেন হাসনা বেগম; বললেন,'এমন করে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি আমাকে, যা, আজাইরা কথা তোর বলতে হবে না। তুই তো চান্স পাবিই। তুই তো আমার সোনার টুকরা মেয়ে।'

'না মা, ভয়ে জান উড়ে গেছে। মা, যদি চান্স না পাই।'

'না পেলে না পাবি। মেডিক্যালে পড়বি। না হলে ইউনিভার্সিটিতে পড়বি। কী হলো তাতে।'

'মা তোমরা আমার বিয়ে দিয়ে দাও, আমি কোথাও চান্স পাবো না।'

'ঠিক আছে, তোর বাবাকে বলে দেবো তোর জন্যে বর খুঁজতে, আপাততঃ বুয়েট থেকে ঘুরে আয়।'

'আমি একা যেতে পারবো না। তুমিও সাথে চলো।'

'যা। বাবুকে নিয়ে যা। বাবু, বাবু, তোর আপার সঙ্গে একটু বুয়েট থেকে ঘুরে আয় তো।

'কোত্থেকে? কুয়েত থেকে? আপা কি কুয়েত যাচ্ছে নাকি?' বাবু পাখির খাঁচার পাশ থেকে জবাব দিলো। আজ তার পাখি টিঁ টিঁ করে ডেকেছে; উৎসাহের তাই অন্ত নেই তার।

খুকু বললো, 'কুয়েত না ভান্দু। বুয়েট। বি ইউ ই টি। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি।'

বাবু ভীষণ হতাশ হলো তার কুয়েত যাওয়ার সম্ভাবনাটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলো দেখে, বললো, 'ও-ও-ও, চলো।'

হাতিরপুল ভূতের গলি থেকে বুয়েট পর্যন্ত খুব বেশি পথ নয়। রিকশায় হুড তুলে দু ভাইবোন চলেছে। বাবু বললো, 'আপা, বলো তো, মা তোমাকে একা না পাঠিয়ে আমাকে কেন তোমার সঙ্গে দিলেন?'

খুকু খুবই উদ্বিগ্ন তার ভর্তি পরীক্ষার ফল কী হবে, তাই নিয়ে। সে অন্যমনস্ক গলায় বললো, 'কেন?'

'কারণ আমি হলাম গিয়ে পুরুষ'—বাবু বললো।

'ওরে আমার সাবালক পুরুষ রে। তুই তো বীরপুরুষ', খুকু বললো।

রাস্তায় দু'বার রিকশার চেইন পড়ে গেছে। খুকু স্থির নিশ্চিত, রেজাল্ট হবে খুবই খারাপ। পলাশীর মোড়ে এসে চেইন পড়লো আবার; রিক্শাঅলা উল্টো রাগ করলো খুকুদের সঙ্গে, বললো, 'নাইমা হাঁইটা যান, আপনেরা হইলেন কুফা প্যাসেঞ্জার, আমার নতুন রিকশা, কুনুদিন চেইন পড়ে না, আইজ কী প্যাসেঞ্জার নিলাম, খালি চেইন পড়ে, আপনাগো লমু না।'

খুকু নেমে পড়লো বাবুর হাত ধরে, রিক্সা ভাড়া ছয়টাকা, ঠিকভাবেই দিলো। তার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ হচ্ছে। তবু এই দুর্যোগের ভেতর সে বাবুকে খোঁচা দিতে ভুললো না, 'কী বীরপুরুষ, রিক্শাঅলা যে মাঝপথে নামিয়ে দিলো।'

বাবু চুপ করে রইলো, সে কথা বলতে পারে ঘরের ভেতরে, বাইরে সে একেবারেই গুটিয়ে যাওয়া কেন্নো।

পলাশীর মোড় থেকে বুয়েটের শহীদ মিনার—সামান্যই পথ, হেঁটে যেতে সময় লাগলো না তেমন। বুয়েট অডিটরিয়ামের সামনের দেয়ালে কম্পিউটার থেকে বের করা সাদা সাদা রেজাল্ট শিট, খোলা আকাশের নিচে আঠা দিয়ে সাঁটা। বেশ ভিড় সে সব কাগজ ঘিরে, ভিড় ঠেলে বাবুর হাত ধরে এগিয়ে গেলো খুকু।

খুকু কাঁদতে লাগলো। ভেউ ভেউ করে কান্না। বাবুও ভয় পেয়ে গেলো, সে কান্নাভেজা স্বরে বললো, 'আপা, চলো বাড়ি চলো।'

খুকু বললো, 'বাবু।' সে কান্না দমন করার চেষ্টা করছে।

বাবু তাকালো বোনের মুখের দিকে, কান্নার আড়ালে যেন হাসির ঝিলিক।

বাবু বললো, 'পেয়েছো, চান্স পেয়েছো?'

'হুম। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ।' বাবুকে জড়িয়ে ধরে হাসি কান্নার অপূর্ব মিশ্রণ চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুললো খুকু।

আমাদের এই মধ্যবিত্তের সেন্টিমেন্টাল গল্প এখন একটা আনন্দপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আসুন পাঠকবৃন্দ, আনন্দ করি। আমাদের একটা মেয়ে, নিতান্তই অভাবী ঘরের একটা মেয়ে, নিজের যোগ্যতায় চান্স পেয়ে গেলো বুয়েটের কম্পিউটার কৌশল বিভাগে, এটা একটা আমোদের কথাই বটে। আসুন, আবিদুর রশিদের পরিবারটিকে একটু উপলক্ষটা-উদযাপন করার সুযোগ দিই, হোক না এমন, খুকুদের পুরো পরিবার আজ খেতে যাক চাইনিজ রেস্তরাঁয়, সবাই মিলে।

আবিদুর রশিদের বাসায় এখন চাইনিজ রেস্তরাঁ যাত্রার প্রস্তুতি চলছে, হাসনা বেগম আজ পরেছেন একটা পেঁয়াজ রঙা শাড়ি, কিন্তু তার ব্লাউজটা ঘিয়ে রঙের, খুকু চিৎকার করে উঠলো, 'এ কী মা, তুমি তো দেখি এখনো অংপুরি খ্যাত রয়ে গেছো, ব্লাউজটা ম্যাচিং করে পরো।' হাসনা বেগমের পেঁয়াজ রঙের ব্লাউজ নেই, হালকা খয়েরি রঙেরও নেই;কাপড়-চোপড়ের শখ এ জীবনে তাঁর আর কিছু অবশিষ্ট নেই—এ নিয়ে তিনি বকতে পারতেন, কাঁদতে পারতেন; কিন্তু এক মধুর হাসি বর্ষণ করে বললেন, 'মারে, আমার এখন শাশুড়ি হবার বয়স, এ বয়সে আমার কি ফ্যাশন করা সাজে! '

'সে কী কথা মা, ওখানে যদি কোনো রাজপুত্র বসে থাকে, সে দেখবে রাজকন্যাটি তো ভালোই,কিন্তু রাজমাতার রুচিটা তেমন দুরস্ত নয়, কী হবে আমার! আসো, এক কাজ করো, আমার জর্জেটের শাড়িটা পরো।'

মেয়ের কাছে হার মানতে হলো মাকে, মা পরলেন মেয়ের শাড়ি ও ব্লাউজ, গাঢ় নীল রঙের শাড়ি; সেই শাড়িতে চল্লিশ বছর বয়সের হাসনা বেগমকে লাগলো অপরূপ, আয়নায় নিজের চেহারা দেখে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু গালে একটু মেছতা পড়েছে, সেটা যদি পাউডার-টাউডার একটা কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতো—নিজের ভাবনায় নিজেই লজ্জিত হলেন তিনি।

এদিকে দাদিআম্মা চিৎকার করছেন, 'ও খুকু, আমার শাড়ির নিচটা একটু টান দেখি; গোড়ালি দেখা যাচ্ছে।'

খুকু বললো, 'দাদি আম্মা, তোমার গোড়ালি তো গোলাপ কুঁড়ির মতো, যাক না দেখা, পরে রাস্তায় দেখা গেলো, বিরাট ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে, সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে তোমার গোড়ালি দেখার জন্য।'

বাবু টুপ করে দাদির পায়ের কাছে বসে শাড়ি টেনে ঠিক করে দিলো, বললো, 'সালাম করলাম দাদিআম্মা, সালামির টাকাটা দাও নগদ নগদ।'

ধোয়া ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে আবিদুর রশিদ বহু আগেই প্রস্তুত। তাঁর উৎসবে যাবার জন্য একজোড়া জুতো আছে, তাকে সেটা খাটের নিচ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, জুতোজোড়া কালি করা দরকার ছিলো, থাক, আজ আর দরকার নাই ভেবে তিনি তাড়া দিতে লাগলেন, 'কই গো চলো, বেশি রাত করা যাবে না, নাও, বেরোও।'

কাজের বুয়াও একটা রঙিন মাড় দেয়া শাড়ি পরেছে, সমস্ত শরীর পেচিয়ে সে পরেছে শাড়িখানা, ফুলে আছে সেটা, মনে হচ্ছে একটা লম্বা সবুজ বেলুন। তার মুখখানাই দেখাচ্ছে সবচেয়ে লজ্জিত লজ্জিত।

বাবু বললো খুকুকে, 'আপা, আমরা সবাই আজ চাইনিজ খেতে যাচ্ছি, তোমার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাওয়া উপলক্ষে ......

বাবু কী বলতে যাচ্ছিলো , সেই জানে, তার অর্ধসমাপ্ত বাক্য আর মাটিতে পড়তে দিলো না খুকু, তার আগেই লুফে নিলো ক্যাচ, বললো, 'তাই নাকি, আমরা কি ধরে ধরে সব চাইনিজকে খেয়ে ফেলবো?'

'মানে,' ভ্রু কুঁচকে বললো বাবু।

'মানে ...চাইনিজ মানে চীনাম্যান। আমরা চীনা লোকদের ধরে ধরে খেতে যাচ্ছি ? আমরা খেতে যাচ্ছি চাইনিজ খাবার। ঠিক আছে ?'

বাবু হার স্বীকার করার পাত্র নয়। ফলো অন এড়ানোর জন্যে সে বুদ্ধি করে বললো, 'ও হো আপা। তুমি এখনো পড়ে রইলে তোমার গ্রামার নিয়ে। অথচ আমার চিন্তা মিঠুকে নিয়ে। আমরা চাইনিজ খাবো মানো চাইনিজ খাবার খাবো, কিন্তু মিঠুর কপালে কি ভেতো বাঙালির খাবারই জুটবে ? ধান আর মরিচ ?'

খুকু বললো, 'এক কাজ কর বাবু। চীনাবাদাম কিনে আন। মিঠুকে খেতে দে। সস্তায় চাইনিজ ডিশ হয়ে যাবে তোর টিয়ার জন্য।'

দাদিআম্মা শাদা শাড়ির ওপরে জড়িয়ে নিয়েছেন একটা কালো শাল। চশমার মোটা ফ্রেমের আড়ালে তার মুখখানা দেখাচ্ছে সিনেমার শাশুড়িদের মতো ।

বাবু গেলো তাঁর কাছে, 'দাদি আম্মা, চাইনিজ হোটেলে নাকি ব্যাঙ খেতে দেয় ?'

'কী বললি ?'

খুকু এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে সে বললো, 'দিতে পারে, সাপ-ব্যাঙ, তেলাপোকা, সবই নাকি দেয়। দেখিস না, চাইনিজ রেস্তরাঁয় আলো থাকে কম, কেন অন্ধকার করে রাখে ওরা ? ওদের কি বাতি জ্বালানোর সামর্থ্য নেই? আসলে ওরা সাপ-ব্যাঙ-তেলাপোকা খাবারে মিশিয়ে দেয় তো, পাবলিক যাতে দেখতে না পায় সেজন্য বাতি কমিয়ে রাখে।'

ওরা এসব বলাবলি করছে, আর বারবার তাকাচ্ছে দাদির মুখের দিকে, কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্য। সত্যি সত্যি দাদিআম্মার মুখ শুকিয়ে এলো , তবু তিনি এ বাজিতে জেতার জন্যে বললেন, 'কী বলিস তোরা ? তোরা ভেবেছিস আমি কোনোদিন খাইনি ওসব।'

খুকু এতো তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেবার পাত্রী নয়। সে বললো, 'জানো দাদি আম্মা , সেই যে আমার বন্ধুরা মিলে চাইনিজ ফুড খেতে গেলাম, ঘর অন্ধকার, হঠাৎ কী হলো জানো, ফটো তোলার জন্যে ফ্ল্যাশ জ্বালানো হয়েছে, অমনি দেখতে পেলাম আস্ত একটা ব্যাঙ, পেঁয়াজের আড়ালে ঘ্যা ঘ্যা ঘোঁ ঘোঁ করছে; ভদ্রতা দেখিয়ে সবাই চুপচাপ সেইসব খেয়ে নিলো, আমি অবশ্য খাইনি বাবা।' খুকু মুখ বিকৃত করার ভান করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একরাশ হাসি এসে কেড়ে নিয়ে গেলো ওর গম্ভীরতা; খুকু, বাবু আর দাদি মিলে হেসে উঠলো, প্রাণখোলা হাসি।

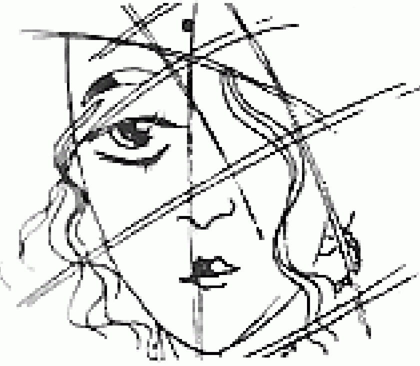
ওরা সবাই মিলে বসেছে চাইনিজ রেস্তরাঁর টেবিলে গোল হয়ে। আবিদুর রশিদ, হাসনা বেগম, খুকু, বাবু , ওদের দাদি আর বুয়া। বুয়া বার বার তার শাড়ির আঁচল টেনে দিচ্ছে গা-পিঠ মুড়িয়ে, গা ঢাকতে গিয়ে বারবার আঁচল পড়ে যাচ্ছে মাথা থেকে। খাবার এসে গেছে টেবিলে,মনে মনে মেয়ের সাফল্য কামনা করে দোয়া পড়ছেন আবিদুর রশিদ। খাওয়া শুরু হলো, সবাই যে যার স্যুপের বাটি নিয়ে ব্যস্ত। কেবল দাদি খাচ্ছেন না।

'কী ব্যাপার দাদিআম্মা, নাও স্যুপ নাও'—বললো খুকু।

দাদি বললেন, 'ওদের কাউকে ডেকে বল্‌না বাতিটা একটু বাড়িয়ে দিতে।'

খুকু হেসে উঠলো। 'রসিকতা করেছি দাদিআম্মা, বাংলাদেশে সাপ-ব্যাঙ খাইয়ে কি কেউ ব্যবসা চালাতে পারে?' 'এক্সকিউজ মি' সে ডাকলো একজন ওয়েটারকে, 'এখানকার আলোটা একটু বাড়িয়ে দিন না, প্লিজ।'

ওয়েটার আলো বাড়িয়ে দিলো। গান বাজছে ক্যাসেট প্লেয়ারে —দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা, হায় রাম বুড়িওকা হ্যায় জামানা।



রিকশাঅলাদের সঙ্গে গল্প করা আবিদুর রশিদের একটা প্রিয় কাজ, যদিও রিকশায় চড়ার ব্যাপারটা তিনি মনে মনে ঠিক মেনে নিতে পারেন না। হাতিরপুলের যানজটের মধ্যে একদিন তিনি বসে আছেন রিকশায়, পরীবাগের দিক থেকে এসেছেন তিনি , তরমুজ-কমলার দোকান হাতের বাঁ পাশে রেখে রিকশা দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনের

বিচিত্র যান ও মানবসমাবেশের স্থিরচিত্রের দিকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাকালেন তিনি, দেখতে পেলেন গাড়ি, রিকশা, অটোরিকশার ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে দুটো মালবাহী গরুর গাড়ি। সেই গাড়ি দুটোর গরুগুলো আকারে বিশাল,তাদের চোখ টানা টানা, তারা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাঁধে বিশাল বোঝার জোয়াল। গোবেচারা গরু দু'টোর দিকে তাকিয়ে আবিদুর রশিদের খুব খারাপ লাগলো, প্রকৃতির মুক্ত সদস্য ভালো স্বভাবের এই প্রাণীটিকে মানুষ এইভাবে ব্যবহার করছে, তার দ্বারা টানিয়ে নিচ্ছে তাদের নানা দুঃসহ ভার— নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হলো আবিদুর রশিদের। মুহূর্তে তার চোখ পড়লো সামনের রিকশাঅলাটার পিঠে, পশু গাড়ি টানে, এ দৃশ্যই তিনি সহ্য করতে পারছেন না— অথচ বসে আছেন এমন একটা যানে, যা টানছে মানুষ। তাঁর নিজের ভার আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি বসে আছেন!

আবিদুর রশিদ রিকশা থেকে নেমে পড়লেন, হাঁটতে লাগলেন বাসার উল্টোমুখো পথে।

হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়লো প্রথম যৌবনের দিনগুলোর কথা, বিয়ের পর হাসনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কক্সবাজারে, সমুদ্র দেখাতে এবং আসলে, নিজেই দেখতে। সমুদ্র তাকে অভিভূত করেনি, তাকে টানছিলো পাহাড়, কী সবুজ রহস্যময় সেইসব পাহাড়। সেই বার কক্সবাজারে তিনি দেখা পেয়েছিলেন এক রিকশাঅলার, যার বাড়ি রংপুরে, মিঠাপুকুরে। এতোদূরে, বাংলাদেশের অন্যপ্রান্তে এসে রিকশা চালাচ্ছো কেন, রংপুরে কি রিকশা চালাতে পারতে না ? তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তাকে। লোকটি, বয়স ৩০/৩২ হবে, বলেছিলো, আমার আসলে জায়গা দেখার শখ; সাগর দেখতে ইচ্ছা করে, পাহাড় দেখতে ইচ্ছা করে, বন-জঙ্গল দেখতে ইচ্ছা করে, ককসোবাজার আসি বসি বসি খাওয়ার ক্ষ্যামতা মোর নাই বাহে, তাই মুই এশকা চালাইতেছোঁ। এভাবেই রিকশাঅলাটি যায় বিভিন্ন জায়গায়, গিয়ে চেষ্টা করে রিকশা চালানোর, এতে তার বিভিন্ন জায়গা দেখার সাধ মিটে যায়। মানুষের কতো শখ, পর্যটন তো কারো কারো রক্তে বোনা নেশা। আবিদুর রশিদেরও ভারি শখ হয়, সব কিছু ছেড়ে একা একা বেরিয়ে পড়েন, চলে যান গারো গাহাড়ে, মিশে যান গারোদের সঙ্গে, কিংবা যেতে ইচ্ছা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে, চাকমা কিংবা রাখাইন মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতে পানি উৎসবে, বিজু উৎসবে। পিজি হাসপাতালের সামনে এসে পত্রপত্রিকার স্টলে দাঁড়ালেন আবিদুর রশিদ। একটা সাহিত্য পত্রিকা হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগলেন। কবিতার পাতায় এসে স্থির হয়ে গেলো চোখ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালেন কবিতার ওপরে। নদহিমইলেক্ট্রোএষণাইলেক্ট্রনব্রক্ষান্ডবীজ ধরনের একটা শব্দের ওপরে চোখ আটকে গেলো তাঁর। এটা সম্ভবতঃ লিট্‌ল ম্যাগাজিন, ঠাওরালেন তিনি; কারণ লিট্‌ল ম্যাগাজিন হলো অ্যাটম বোমার মতো, আকারে একটা কবুতরের সমান, কিন্তু ফাটলে পড়ে হিরোশিমা-নাগাসাকি।

পত্রিকাটা হাতে নিয়েই ছিঁড়ে যাওয়া চিন্তাসূত্র জোড়া দিতে লাগলেন তিনি, কী নিয়ে যেন ভাবছিলেন, কী যেন নিয়ে, ও হ্যাঁ, রিকশাঅলা। ঢাকায় একদিন আরেকটা রিকশাঅলা পেয়েছিলেন, গাইবান্ধার বোনারপাড়া বাড়ি, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে বড়ো ভাইয়ের ওপরে রাগ করে, বড়ো ভাই তাকে জমিজমার ভাগ দিতে চাইছিলো না। এই রিকশাঅলা রোজ ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করে, মাসে তার জমে দেড় হাজার টাকা, বছরে জমে ১৮ হাজার, তিন বছরে জমিয়েছে ৫০ হাজার; সামনের ঈদে সে বাড়ি যাবে, গিয়ে ভাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিনবে জমি।

জমি-জিরাতের কথা আবিদুর রশিদের চিন্তাকে এবার নিয়ে গেলো তাঁর গ্রামের দিকে। গ্রামে তারও কিছু জমিজমা আছে, গোবিন্দগঞ্জের সাতকানি গ্রামে। তার বড়ো ভাই মারা গেছেন, ভাস্তেরা কেউ স্থায়ী হয়েছে গোবিন্দগঞ্জে, কেউ রংপুরে, কেউ পলাশবাড়িতে। গাঁয়ের বাড়িটি পড়েই থাকে, কাজের লোকের হাতে ভার পাহারা দেবার; বাঁশঝাড়ের নিচে দেয়া বাবার কবরটির পাশে কেউ আর দুদণ্ড দাঁড়ায়ও না, বোধ হয়। মা তাঁর ছিলেন চৌধুরী বংশের মেয়ে, পড়াশুনা করেছিলেন ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত, এখনও নভেল পড়তে খুবই পছন্দ করেন। হ্যাঁ, কিছু জমিজমা আছে তাঁর, সেগুলো বর্গা দেয়া, বছরে দুবার মানি অর্ডার করে ধান বেচা টাকা আসার কথা তার নামে, কোনোবার আসে, কোনোবার আসে না; চিঠি আসে মাঝেমধ্যে। তার অংশের জমিজমাগুলো দেখে হামেদালি; সে তাদের এক ধরনের ভাই হয়, হামেদালি চিঠি লেখে— এ বছর বান আসিয়া দুই দুইবার ফসল খাইয়া গেছে; ফলে এইবার টাকা পাঠানো যাইতেছে না।

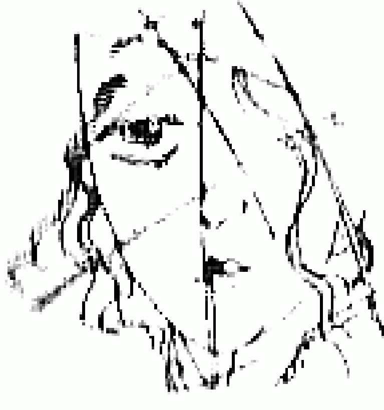
জমিজমার কথা উঠলেই আবিদুর রশিদ আবার হয়ে পড়েন আব্দুর রশিদ সরকার, তাঁর বাবা ছিলেন আব্দুর রহমান সরকার; আবিদ অবশ্য কোনোদিনই নামের সঙ্গে সরকার লেখেননি। জমিজমার কথা তিনি মনে করতে চান না, যদিও সবই পারতেন, ছোটোবেলায় লাঙ্গলের খুঁট ধরেছেন, মইয়ের ওপরে চড়েছেন; গরু গাড়ি চালাতে পারতেন অবলীলায় , খালি পায়ে হাঁটতে পারতেন মাইলের পর মাইল; গ্রামে বলতো ক্রোশ, দুমাইলে হবার কথা এক ক্রোশ, কিন্তু কয় মাইল গেলে যে এক ক্রোশ হতো, গ্রামে সেটা কেউ জানতো না; গ্রামের পথ ছিলো বড়ো দীর্ঘ। আর বর্ষাকালে যখন ডুবে যেতো বাড়ির চারপাশ, নৌকা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুনোর কোনো উপায় থাকতো না, নৌকা বাইতে পারতেন ভালো; নৌকা বাইচ খেলতেন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে— হেঁইয়ো রে বাইচের নৌকা হেঁইয়ো, হেঁইয়ো। ধানের মৌসুমে ভাড়ে করে জিলাপি আর সাবান নিয়ে আসতো ব্যাপারিরা, চিটা ধানের বিনিময়ে খাওয়া সেই সব গুড়ের জিলাপির স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে তাঁর।

রিকশাঅলা— রিকশাঅলাদের নিয়ে ভাবছেন তিনি; হ্যাঁ, একবার একজন রিকশাঅলা পেয়েছিলেন গোয়েন্দা পুলিশের লোক। একটা বেবি ট্যাক্সি রিকশাটাকে

ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো, সহসা রিকশাঅলাটা পকেট থেকে বের করলো হুইসেল, বাজালো সংকেত ধ্বনি, চারদিকে এক সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো ট্রাফিক পুলিশ, ধরে ফেললো অটোরিক্সাঅলাটিকে, তারপর রিকশাঅলাটা রিকশা থামিয়ে দাঁড়ালো সেই বেবিঅলার পাশে, বললো, ফাজলামো কার সঙ্গে করছিস, এক চড়ে দুপাটি দাঁত বের করে ফেলে দেবো, হারামজাদা।'

আবিদুর রশিদ আবার ঢুকে পড়লেন রমনা পার্কে, রমনা লেকের পানি তাকে বড়ো টানে। বসে পড়লেন পার্কের একটা বেঞ্চিতে, পকেট থেকে টাকা বের করে বাদাম কিনলেন দুটাকার।

দুপুরবেলা, আকাশে গন গন করছে সূর্য। তার বেঞ্চে এসে বসলো একটা হতচ্ছাড়া আকৃতির লোক, তার গায়ে হলুদ রঙের শার্ট, চোখে কালো চশমা। আবিদুর রশিদের পছন্দ হলো না লোকটিকে, তিনি পাশে বসে কাচ আর চোখের ফাঁকের পরিসর টুকুর ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করলেন লোকটির দৃষ্টিক্ষেপ। লোকটির চোখ সামনের ডানদিকে কিছু একটা দেখছে, গভীর মনোযোগে। আবিদুর রশিদ তাকালেন সামনে, ডানদিকে; দুটো মেয়ে নেমে পড়েছে জলে, তাদের শরীর জলমগ্ন, কেবল জেগে আছে মাথা দুটো। মেয়ে দুটো ধীরে ধীরে তীরের দিকে আসছে, আবিদুর রশিদ আবার তাকালেন হলুদ শার্টের কালো চশমার নিচে, আবার দৃষ্টি ফেললেন সামনে। দুটো সম্পূর্ণ শরীর মেয়ে, তাদের পাতলা শাড়ির আঁচল ঠেলে ফুটে উঠেছে পূর্ণ বুক, দু'বুকের মধ্যখানে কালো ছোটো বৃত্ত, জলভেজা পিছল দেহ খুবই বিপজ্জনকভাবে আকর্ষক হয়ে উঠেছে। আবিদুর রশিদের মনে হলো তিনি আরো খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে, উল্টোদিকে হাঁটতে লাগলেন জোরে জোরে। পেছনে তিনি আর তাকাবেন না, পেছনে তিনি আর তাকাবেন না; কিন্তু পা চল্লিশেক হাঁটার পর আরেকবার ফিরলেন পেছনে, এক পলক। বুঝলেন ঝোপের ওপরে শাড়ি রেখে মেয়ে দুটো কাপড় পাল্টাচ্ছে। আবিদুর রশিদের মনে হলো, ঝোপের আড়ালে তিনি বসে পড়েন আরেকটা বেঞ্চিতে, তারপর নিরাপদ দূরত্ব থেকে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে দেখে নেন মেয়ে দুটোর কাপড় পাল্টানো, মানসচক্ষে তিনি দেখতে পেলেন, কাপড় পাল্টানোর আগে বুকের ভিজে আচলটা সরিয়ে মেয়ে দুটো পেছনের লম্বা চুল ঝাড়ছে আর নাচছে আর নাচের তালে তালে দুলে উঠছে তাদের সমস্ত সৌন্দর্যভার। কিন্তু এই চিন্তাও লজ্জিত করলো তাঁকে, তিনি খুবই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন পার্ক থেকে এবং সিদ্ধান্ত নিলেন— এই পার্কে আর নয়। তিনি আবার উঠে পড়লেন রিকশায়, তার চোখ আবার আটকে গেলো রিকশাঅলার ঘর্মাক্ত পিঠে, কিন্তু সেই পিঠ নয়, তার বোধ জুড়ে দুটো বুকখোলা রমণী নেচে নেচে চুল মুছে চললো।



'বাবা, তুমি আজ দুপুরে কই গিয়েছিলে?' খুকু জিজ্ঞেস করলো। আবিদুর রশিদ সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেলেন, আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'দোকানে।'

'না, বাবা। দুপুরে আমি তো দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় তোমার খোঁজ করলাম, তুমি তো ছিলে না বাবা।'

'তখন মনে হয় আমি জ্যামে আটকা পড়েছিলাম হাতির পুল মোড়ে', বললেন আবিদুর রশিদ। মনে হলো, মেয়ে সব দেখে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে নৃত্যপরা মানসিক্তাদের দিকে ফ্যাল ফেলিয়ে তাকিয়ে থাকা তার বাবাকে।

মেয়ে বললো, 'বাবা, তুমি তো দোকানে যাবার নামে বেরিয়ে পড়ো, কিন্তু প্রায় কেনোদিনই ও মুখো হও না।'

'ওই দোকানে যেতে আমার ভালো লাগে না খুকু। দেখ, একজনের মৃত্যু হলে তারপর আমার দোকানে কিছু বিক্রি, কিছু লাভ—এটা আমি ভাবতেও পারি না।' আবিদুর রশিদের গলা ভেজা ভেজা শোনালো।

খুকু বললো, 'বাদ দাও বাবা। এই তো বেশ আমাদের চলে যাচ্ছে।'

'তুই দোকানে কেন গিয়েছিলি? কোনো দরকারে?'

'না বাবা। ওই দোকান তো আমার যাওয়া আসার পথে পড়ে। ইউনিভার্সিটি থেকে আসছিলাম। আজ ভর্তি হয়ে এলাম বাবা।'

'ওঃ, ঠিক আছে। তোর কোনো কিছু দরকার হলে বলিস।'

'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলবো। আমার সঙ্গে আর যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছে, তারা বলছিলো, তাদের অনেকেই পিসি কিনেছে। যারা কেনেনি, তারাও কিনবে বলছে।'

'কী কিনেছে বললি?'

'পিসি। পারসোনাল কম্পিউটার।'

'ও।'

'বাবা, একটা পিসি মনে হয় আমারও লাগবে। অবশ্য ক্লাস শুরু হতে এখনো দেরি আছে।'

'লাগলে কিনে দেবো। কবে লাগবে।'

'তাড়া নেই। দু এক মাস পরে কিনলেও চলবে।'

'দেবো কিনে। চিন্তা করিস না। দাম কতো?'

'হাজার চল্লিশেক হবে। আমি ঠিক জানি না বাবা।'

দাম শুনে আবিদুর রশিদ একটু ঘাবড়ে গেলেন। এতো টাকা তাঁর হাতে নেই। সম্ভবতঃ তাঁর একাউন্টে হাজার দশেক টাকার বেশি নেই। তাঁর দোকান থেকে যা আসে, তাতে তাঁদের সংসারের খরচ কোনো মতে চলে যায়। বাড়ি থেকে বছর শেষে অল্প কিছু টাকা আসে। সব মিলিয়ে তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা কোনোদিনও আসেনি বটে, তবে বড়ো কোনো অভাব-অভিযোগের মুখেও তেমন পড়েননি তারা।

'বাবা, আমি কি তোমাকে কোনো চাপের মুখে ফেললাম। বাবা, শোনো, আমি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি। বুয়েটের পড়াশুনা যদি এক্সপেনসিভ হয়ে যায়, আমি কিন্তু বাদ দিয়ে দিতে পারি। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে বাবা আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'না না। তোকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুই পড়াশুনা ভালো করে কর। কাকের ঘরে তুই আমাদের কোকিলের ছা। কুহু কুহু না করে তুই করবি কা কা, তা কি হয়?'

আবিদ দেখলেন মেয়ের দুচোখ ভরে এক অনির্বচনীয় দুঃখ, দুঃখের ছায়া। তিনি বললেন, 'শোন তোকে একটা কবিতা শোনাই। রবিঠাকুরের 'এবার ফিরাও মোরে'--

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা কার শঙ্খ উঠিয়াছি বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে।

আবিদুর রশিদের মেঘমন্দ্রকণ্ঠস্বর এই কাব্যটুকুনকে বিষণ্ণ করে তুললো। খুকুর চোখ উঠলো ছলছলিয়ে। তিনি তাড়াতাড়ি কবিতার বদল ঘটালেন। এবার তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন--

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো।
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব---
মাথা ও মুন্ডু, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।

জলকণায় হেসে উঠলো বিজলিঝলক, খুকু বললো, 'বাবা তুমি তোমার কবিতার খাতাটা আমাকে দিও, আমি তোমাকে বই বের করে দিবো।'

কবিতার কথা ওঠায় আবিদুর রশিদ লজ্জা পেয়ে গেলেন, এবার তিনি আড়াল খুঁজতে কক্ষত্যাগ করলেন নিজ উদ্যোগে।

আবিদুর রশিদ সচরাচর রিকশা ছেড়ে দিয়ে পারাপার স্টোরে বসেন না। কিন্তু আজ সকালে তাকে দেখা গেলো সেটা করতে। তিনি নিজে থেকে গেলেন দোকানের ভেতরে, খদ্দেরদের জন্যে রাখা হাতল ছাড়া চেয়ারগুলোর একটিতে বসে পড়লেন।

আবদুল হাই চিন্তিত হয়ে পড়লো, ব্যাপার কী, সাহেবের আজ কী হয়েছে?

গুল্লুমিয়া বললো, 'ছার কি খাইবেন, চা লইয়া আসুম?'

আবিদুর রশিদকে দেখা যাচ্ছে চিন্তিত, তিনি আব্দুল হাইকে বললেন, 'কিছু টাকা দরকার ছিলো। যোগাড় করা যায়?'

'কতো স্যার?'

'বিশ-ত্রিশ হাজার। মাস খানেক সময়ের মধ্যে কি বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা প্রফিট দাঁড়ানো যায়?'

আবদুল হাই বললো, 'আল্লার ইচ্ছা। তিনি মুখ তুলে চাইলেই হয়।'

গুল্লু মিয়া বললো, 'ছার আইজকা আমার হাতের তলায় চুলকাইতেছে, হেভি চুলকানি, মনে কয়, আইজকায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকার বিজনেস হইয়া যাইবো।'

আব্দুল হাই গুল্লুমিয়ার চুল টেনে দিলো। 'চুপ কর তো, স্যারের সামনে একদম বকবকাইবি না।'

গুল্লু মিয়া চুপ করবার পাত্র নয়, বললো, 'ছারের মুখ দেইখা মনে হইতাছে খুব চিন্তা, ছার চিন্তা কইরেন না, চাইরটা বড়লোক যদি আইজকা রাইতে মইরা যায়, কাইলকা সকাল হইতে না হইতেই চল্লিশ হাজার পাইয়া যাইবেন। কী কন?'

আবিদুর রশিদ খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন, এই ছেলে কী বলে, আজ রাতে চারজন মানুষ মারা যাক, এটা সে বলছে কী অবলীলায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই হাতে এসে যাবে চল্লিশ হাজার টাকা, এই আশা তাঁর লোভের জিভেয় সঞ্চার করলো জল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন–ছি! ছি, এ কী ভাবছি আমি! মানুষের মৃত্যুর

বিনিময়ে অর্থাগম-ভাবনা! তাঁর মনের মধ্যে নৃত্য করে উঠলো দুটো ভরন্ত দেহ নারী, তাদের নিম্নাঙ্গে সিক্তবসন, ভিজে ওপর-দেহ খোলা, তারা চুল ঝাড়ছে আঁচল দিয়ে, নেচে উঠছে তাদের দেহভার, বক্ষ সম্পদ; তিনি সেদিকে তাকাতে পারছেন না; তার খুব ইচ্ছে করছে তাকাতে, তিনি পারছেন না, চক্ষুলজ্জা, সম্ভ্রমবোধ, সংস্কার, সংস্কৃতি বিপুলভাবে ঢেকে দিচ্ছে তার দু'টি চোখ।

গুল্লু বললো, 'ছার, আইজকাল মাইনষে মরবার চায় না। ছার, ক্যান্সার না কি একটা অসুখ আছে, এইডা দ্যাশে আসতে পারে না? খুব ভালা হইতো! আরেকখান অসুখ আছে। বাপের ব্যাডা অসুখ! এইড্স। গাড়ির গায়ে পড়ছি। যে রোগের পরিণাম মৃত্যু।'

আবিদুর রশিদ সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বলা নেই কওয়া নেই, তিনি এক চড় মেরে বসলেন গুল্লুর গালে।

এইবার, ও পাঠক, (ও পাঠিকা,) এইবার আপনাদের অখন্ড মনোযোগে আমি বিরাম ঘটাবো, স্যরি ফর দি ইন্টারাপশন; কিন্তু জানেন, এই বঙ্গ ভাষায় উপন্যাসের জনক বঙ্কিম বাবু প্রায়ই পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন, তারো আগে আমাদের কবিয়ালেরা সরাসরি কাহিনীকাব্য পরিবেশন করতেন দর্শকদের সামনে। এখন আমার বলার কথা এই যে, চড়টা মেরেই পারাপার স্টোর ত্যাগ করলেন আবিদুর রশিদ; চড়টা মেরে তিনি বেশ একটা আরাম বোধ করলেন; কারণ এই চড়টা আসলে তিনি মেরেছেন তার নিজেরই গালে, যেন পেছনে ধাবমান ইবলিশকে তিনি ছুঁড়ে মারলেন প্রস্তর কিংবা পাদুকা; কারো মৃত্যু তিনি কামনা করতেই পারেন না; কোনো আভাসে নয়, ইঙ্গিতে নয়।

হতে পারে, এমনটা হতে পারে; আমাদের কাব্যপ্রেমিক মধ্যবিত্ত রোমান্টিকভাবে সৎ, অত্যন্ত সৎ থাকার স্বপ্ন তারা দেখে চলে অবিরতভাবে। দেখেছেন আশাকরি, আমাদের ঘুষখোর আমলারা অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দাড়ি রাখেন, টুপি পরেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হয়ে পড়েন, হজ্ব সারেন, পাড়ার মসজিদে চাঁদা দেন আর ভাবেন, হে আল্লাহ, পুণ্যের পাল্লায় আমি কতো কী যোগ করলাম, সামান্য কটা পাপ, তার চেয়ে এই সোয়াবের ওজন কি বেশি হবে না? আল্লাহ গাফুরুর রাহিম, আমাদের সব পুণ্যবান ঘুষখোররাও তার মাফ পেয়ে যাবে, এ ভরসা আমরা ছাড়বোই বা কী করে!

'ঘুমুলে?' আবিদুর রশিদ বললেন।

হাসনা বেগমের দুচোখ ভেঙে আসছে ঘুম। সারাদিন তাঁকে প্রচন্ড খাটতে হয়

ঘরদোর সংসারের পেছনে। রাত্রিবেলা শুয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আবার ওঠেন খুব ভোরবেলা।

'না, ঘুমোইনি' তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বললেন তিনি।

'কিছু টাকার দরকার। মেয়েটাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবো বলেছি।'

'কতো?'

'চল্লিশ।'

'চল্লিশ কী?'

'হাজার।'

চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেলো হাসনা বেগমের।

'এতো টাকা। কোথায় পাবে?'

'সেটা নিয়েই তো চিন্তা।'

'আমার তো আর কিছু নাই। গলারটা কানেরটা বেচা হয়ে গেছে কবেই? ওই যে বন্যার বছর বললে ব্যবসাটা বড়ো করবে।'

'না তোমার জিনিসে হাত দেবো, বলি নাই তো?'

'আমার জিনিস তো আর কিছু নাই। শুধু হাতের দুটো বালা আছে। মেয়েটাকে একটা চেইন বানিয়ে দিয়েছি। খুব খারাপ লাগে। মেয়েটা বড়ো হচ্ছে। ওকে কিছু বানিয়ে দেওয়া দরকার।'

'ভাবতে হবে না। তুমি ঘুমাও।'

আবিদুর রশিদ পাশ ফিরে শুলেন, ভান করলেন ঘুমিয়ে পড়ার। আসলে জেগে রইলেন, নানা ভাবনার জগতে। অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন ঘাপটি মেরে। হাসনা মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

না। একটু পরে শুনতে পেলেন বিনবিনিয়ে কান্নার আওয়াজ। হাসনা কাঁদছে। এই মহিলা তার সঙ্গে একই ঘরে কাটাচ্ছে উনিশ বছর। কখনো তার মতো করে তাকে ভাবা হয়নি।

এই কান্নার কারণটা আবিদুর রশিদ সনাক্ত করতে পারলেন বলে মনে হলো। সোনা হলো মেয়েদের নিরাপত্তার প্রাণভোমরা। এটা হারালে মেয়েরা তা মেনে নিতে পারে না।

আবিদুর রশিদ ফিরে শুলেন স্ত্রীর দিকে। একটা হাত রাখলেন হাসনা বেগমের পিঠে। হাসনা বেগমের কান্না ধীরে ধীরে মিইয়ে এলো।

আবিদুর রশিদ বললেন, 'ভাবছি, দেশে যাবো। জমিগুলো থেকে আর কিছু আসে না। ওগুলো শুধু শুধু রেখে কী লাভ? দেখি কারো হাওলায় দিয়ে নগদ কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

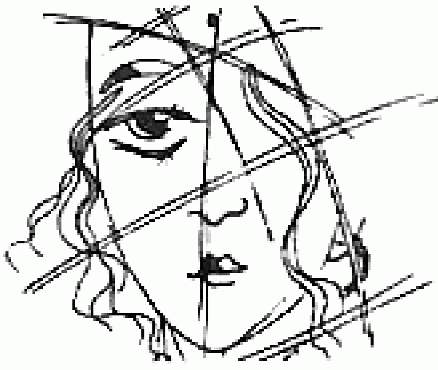
হাসনা বেগম স্বামীর গায়ে হাত রাখলেন। জমি বিক্রির প্রস্তাবে তার সমর্থন আছে কিনা, বোঝা গেলো না। বললেন, 'আম্মাজান খুব কষ্ট পাবেন। তাঁর শ্বশুরের জমি জিরাত। তাঁর নিজেরও অনেক স্মৃতি।'

'তা পাবেন। বুড়ো মানুষ। এই বয়সে তাঁকে আঘাতটা দেয়া কি ঠিক হবে? তুমি এক কাজ করো, মাকে কিছু বলো না।'

হাসনা বেগম ঘুমিয়ে পড়লেন, স্বামীর গায়ে হাত রেখে, নিশ্চিন্তে।

আবিদুর রশিদেরও তন্দ্রামতো এলো। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, রংপুর জিলা স্কুলের হোস্টেলের মাঠে মঞ্চ। মাঠ ভর্তি ছাত্র, সামিয়ানার নিচে। তিনি আবৃত্তি করছেন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে--

শুধু বিঘে-দুই ছিলো মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই—
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'



বহুদিন পরে আবিদুর রশিদ চলেছেন নিজ গ্রামের পথে।

ঢাকা থেকে এসেছেন নাইট কোচে, বাস তাকে রাখালডাঙ্গায় নামিয়ে দেবে ভোর চারটায়, তারপর চলে যাবে রংপুরের দিকে, এমনই কথা ছিলো। তিনি চিন্তিত ছিলেন–এতো রাতে পৌঁছে কী করবেন, নাকি নেমে পড়বেন গোবিন্দগঞ্জ বন্দরে; ভেবেছিলেন, না, রাখালডাঙ্গাতেই নামবেন, সেখান থেকে তাদের বাড়ি ছমাইল দূরে, হেঁটে হেঁটে রওনা দেবেন গাঁয়ের দিকে, ভোরবেলা পৌঁছে যাবেন বাড়িতে।

কিন্তু জট পাকালো আরিচাঘাটে, ফেরিতে বাস উঠতে উঠতেই বেজে গেলো রাত দুটো। নগরবাড়িতে পৌঁছলেন ভোর পাঁচটায়; সেখান থেকে রাখালডাঙ্গায় বাস এলো দৈত্যের মতো, ভীষণ বেগে , ক্যাসেট প্লেয়ারে বাংলা ছবির গান বাজিয়ে। বাসের সহযাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তিনি জেগে ছিলেন, বাংলাদেশের সিনেমার গানের কথা শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে।

যামু না যামু না তোমার বাড়ি যামু না,
খামু না খামু না দাদির গালি খামু না।

রাখালডাঙ্গা অনেক বদলে গেছে, এখানে একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ ছিলো, সেটা নেই, একটা চায়ের দোকান হয়েছে, আরো দুটো ছোটো পানবিড়ির দোকান, একটা সাইকেলের মেরামতখানা কাম গ্যারেজ। বাসে ওঠার জন্যে এখানে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে সাইকেলে, এই গ্যারেজে সাইকেল রেখে নিশ্চিন্তে চলে যায় বগুড়া-রংপুর-গাইবান্ধা। একবেলা দুবেলা, একদিন দুদিন পরে ফিরে এসে সাইকেল নিয়ে আবার ফিরে যায় যার যার বাড়িতে।

আগে তাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতো না কোনো রিকশা, গরুগাড়ি অবশ্য যেতো। বোলমারির পুলের কাছে রাস্তা থাকতো বানে খাওয়া। এবার এই সকাল সাড়ে আটটায় তিনি পেয়ে গেলেন রিকশা। বাড়ি পর্যন্ত রিকশা ভাড়া ঠিক হলো কুড়ি টাকা, রিকশাঅলা বললো সে প্যাসেঞ্জার তুলবে শেয়ারের। তোলো। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সকালে কাউকে পাওয়া গেলো না যে রাখালডাঙ্গা থেকে যাবে সাতকানির দিকে; অগত্যা ব্যর্থ মনোরথে চললো রিকশাঅলা, একবার প্যাডেল মেরে, একবার নেমে টানতে টানতে।

'চেয়ারম্যান কে এখন?'

'সগির বিএ'। বিএ-টা নাম নয়, ডিগ্রি, তবু সেটা নামের মতোই লেগে আছে আদ্যাংশের সঙ্গে।

'কোন বাড়ির?'

'পশ্চিম পাড়ার মন্ডলবাড়ির। আব্দুমন্ডলের বড়ো বেটা।'

'এমপি কেটা?'

রিকশাঅলাটার অল্প বয়স। সে এমপির নাম বলতে পারলো না।

'কোন মার্কা জিতেছিলো? লাঙ্গল না?'

'হয় বাহে। লাঙ্গলই তো। এরশাদের পার্টি।'

'এরশাদের পার্টিকে ভোট দিতে গেলো কেন লোকে? লোকটা অসৎ তো। টাকাপয়সা মেরে টেরে দিয়েছে'।

'দ্যাশের আজার কি ট্যাকার অভাব। ওগলা মিছা কতা।'

'মেয়ে-টেয়ে নিয়েও তো কেলেঙ্কারি আছে। দুটো বিয়ে করেছে। অন্যের বৌকে জোর করে------

'দ্যাশের আজা। আজাবাদশার বেগম তো থাকা নাগে সাতটা। আজা কি হামার মতো গরিম মানুষ। হামরা গরিম মানুষ, ফড়িংখাই, হাতিত চড়্যা হাগবার যাই।'

রিকশাঅলা মাঝেমধ্যেই নামছে। তার পায়ে জুতো-স্যান্ডেল কিছু নেই। ঢাকার রিকশাঅলারা ইদানীং বোধহয় আর খালিপায়ে রিকশা চালায় না, খালিগা রিকশাঅলাও খুব কম দেখা যায়।

'আবাদের খবর কী? চারদিকে ইরির ক্ষেত দেখছি।'

'হ বাহে। ইরির আবাদ খুব। দেখেন না কতো মেশিন। ডিপ টিউকল, শ্যালো টিউকল। কিন্তুক সার নাই বাহে। মাইনষের মাথা খারাপ। পাগল কর‍্যা মারার দশা।'

'হ্যাঁ, খবরের কাগজে পড়েছি।'

রাস্তায় মাটি কাটা হয়েছে সম্প্রতি। রাস্তা প্রশস্ত, আগের চেয়ে অনেক। কাজের বিনিময়ে খাদ্য—টেস্টরিলিফের কাজ।

রিকশা গিয়ে দাঁড়ালো বাড়ির খুলিতে (খোলায়)। সকালবেলা রিকশা আসতে দেখে ভিড় করলো ন্যাংটো ছেলের দল, তাদের কোমরে ঘুঙুর বাঁধা কালোয় সুতোয়। একটু দূরে টিউবওয়েল পাড়, কলস ভরে পানি নিতে এসেছে কার যেন বউ, গায়ে কালচে নীল রঙের শাড়ি, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে কলস কাঁখে বিদায় হলো। টিউবওয়েলের পাড়টা পাকা, সামনে হাত পাঁচেক লম্বা পাকা ড্রেন, সেটার শেষে প্যাচপেচে কাদায় চ্যাপটা ঠোঁট ডুবিয়ে খাবার খুঁজছে এক পাল হাঁসের বাচ্চা। ঘরের গাদায় বাছুর বাঁধা, গোবর ছড়ানো ইতস্ততঃ।

আবিদুর রশিদ নিজের বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হামেদালির বউ এসে বললো, 'সালাইমালাকুম, ভাইজান, কতো দিন পর আসনেন। বসেন, বসেন।'

কাঠের ঘর, দুটো একই সঙ্গে, সামনে বারান্দা, মাটির; বাবা-মা থাকতেন এই ঘরে। বারান্দায় লো বেঞ্চি পাতা, তার নিচে একটা ছাগল ছানা বাঁধা। ছাগলের নাদি ছড়ানো; উঠোন ভরে মুরগি চড়ছে। আবিদুর রশিদ বসলেন। কাঁসার বদনায় করে পানি এনে দিলো হামেদালির বউ।

ঘরদোরের অবস্থা বেশ বেহাল।

হামেদালি ক্ষেতে গিয়েছিলো, তাকে ডেকে আনতে ছুটেছে হামেদালির ছোটো ছেলে।

'ছোটো মিয়া, আসনেন মেলা দিন বাদে, সমাচার ভালো? ভাবী? ছেলেমেয়ে?'

ঘর খুলে দেয়া হলো। ঘরের ভেতরে পাটের স্তূপ। হামেদালি বললো, 'ওষ্টার দর নাই, বেচা-থোয়া একই কতা। থাকলে পর দড়ি বানান যাবি।'

হামেদালির বউ বললো, ছোটো ভাইজান বাড়ি ঘর ভুল্যা গেছেন। ছোলপোলগুলাক দেখবার হাউশ হয় না বাহে। বাপ-দাদার ভিটা কি অরা দেখপে না?'

দুপুরে মুরগি ধরা হলো। ছেড়ে দেয়া হয়েছে সকালে, এখন ধরা কঠিন, ভাত ছিটিয়ে মাছ ধরার জাল দিয়ে খ্যাপ মেরে ধরা হলো মুরগি। পেটে ডিম ছিলো। বড়ো বড়ো ডিমকটা, ছোটো ছোটো অনেক। সব তুলে দেয়া হলো আবিদুর রশিদের পাতে।

খেতে খেতে হামিদালির কাছে পাড়লেন কথাটা; সিঁদুরে আমের গাছের নিচের দুই বিঘা আর চৈতের ভিটার তিন বিঘা, পাঁচ বিঘা ধানী জমি বেচলে দাম কতো উঠবে?

হামিদালি গম্ভীর হয়ে গেলো। এই জমিগুলো আদি দেয়া আছে পূব পাড়ার কাসেমের কাছে। ওরা অবশ্য ফসল ঠিকভাবে দিতে চায় না। না চাক। তবু দেখাশোনা করে হামিদালি ভালোই পায়।

যা ওরা দেয়, তার অনেকটাই যায় হামিদালির পেটে।

'না না, জমি কিসক বেচবেন ছোটো মিয়া। বাপ দাদার জমি!'

'তুমি চিন্তা করো না হামেদালি। তোমাকে আমি ঠকাবো না। গোরস্তানের পাশের তিনবিঘা জমি আমি তোমার নামেই লিখে দিয়ে যাবো। তোমাকে আর আমাকে আদির অর্ধেক দিতে হবে না। ওই জমি দুটো আমি বেচবোই। তুমি লোক দেখো।'

বিকেলে আবিদুর রশিদ বের হলেন গ্রাম দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন শ্মশান ঘাট পেরিয়ে হিন্দু পাড়া ছাড়িয়ে অনেক দুর। গ্রামে খুব শীত, তাঁর খুব শীত করতে লাগলো, গায়ের চাদর পেঁচিয়ে পড়লেন। নদীর ধারে গেলেন। নদী সরে গেছে অনেক দূরে। পথে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হলো। কতোজনকে চিনলেন, কতোজনকে নয়।

শীতের নদী শুকনো! খেয়াঘাটকে তারা বলে মাড়। শীতে মাড় চলে না। আড়াআড়ি বাঁশের সাঁকো : শুধু নৌ চলাচল অব্যাহত রাখার জন্যে একটা জায়গায় দুটো বাঁশ। পালতোলা নৌকা যাবার সময় বাঁশটা তোলা হয় কুয়োর আড়ের মতো করে।

অন্ধকার হয়ে এলো। ঝিঁঝিঁর ডাক, জোনাকির আলো। দূর গাঁয়ে পিদিম জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন বাড়িতে। হামেদালি হাটে গেছে, এখনো ফেরেনি। হারিকেনের চিমনিটার অর্ধেকটা কালো। বারান্দার বেঞ্চে এসে বসলেন আবিদুর রশিদ। বাঁশঝাড়টার মাথায় চাঁদ উঠেছে।

বাবার কবরের কথা মনে পড়লো। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে;
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে, নিজের বাড়ি নিজের ঘর, তাঁর শৈশবের স্মৃতিমাখা এই কড়িবর্গা, এই পাট-পাট গন্ধ, তবু ভালো করে রাতে ঘুম হলো না আবিদুর রশিদের। খুব মনে হতে লাগলো বাসার কথা; হাসনার কথা, খুকু-বাবুর মুখ। বাইরে মোরগ ডাকছে, আর কতো কতো পাখির কলকাকলী; উঠে পড়লেন অন্ধকার থাকতে থাকতেই। হ্যারিকেনের চিমনি সারারাত জ্বলে জ্বলে প্রায় পুরোটাই হয়ে পড়েছে কালো, বেরিয়ে পড়লেন— একটা আমগাছের ডাল ভেঙে বানালেন দাঁতন; দাঁত মাজতে মাজতে হাঁটতে লাগলেন মধুকূপির ভিটের দিকে। এখানটায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া আমগাছ ছিলো, মালদহের আম, চ্যাপ্টা সরা আম; সেসব কেটে ফেলা হয়েছে,

জায়গাটা এখন লাগে ফাঁকা ফাঁকা। ভোর হতে না হতেই কিষাণেরা বেরিয়ে পড়েছে, দল বেঁধে যাচ্ছে মাঠে, গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে রাখাল। আঁখ খেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শুকনো আঁখ-পাতা; ছোটোবেলায় খুব প্রিয় খাবার ছিলো বুটকালাইয়ের গাছ তুলে লাঠির ডগায় বেঁধে আঁখের পাতার আগুনে সেঁকে খাওয়া—মনে পড়লো আবিদুর রশিদের।

রোদ উঠলে ফিরে এলেন বাড়িতে, দেখতে পেলেন অনেকেই এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে; হামেদালি গতকাল যে হাটে গিয়েছিল এ হচ্ছে তারই ফল; অনেকেই জেনে গেছে সরকার বাড়ির ছোটো মিয়ার আগমনের খবর।

তাঁর বন্ধু, মুখটা মনে আছে, নামটা মনে আসছে না, খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলো তাঁর, প্রাইমারি স্কুলে পড়েছিলেন এক সঙ্গে, দুজনে একেবারে মানিকজোড় ছিলেন বলা যায়, আশ্চর্য, বড়োই লজ্জার ব্যাপার, অস্বস্তির—নামটা মনেই পড়লো না।

'কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করলেন। শৈশবে নিশ্চয়ই চলতো তুই তোকারি।

'আর থাকা। আছোঁ কোনো মতন।'

'গ্রামে অভাব কি কম মনে হয় একটু?'

'কী কন বাহে? কার্তিক মাসটা ক্যাংকা কর‍্যা যায়, গরিম মানুষগুলাই জানে। না খায়া থাকে, ভাত নাই, মোর শরিকের ঘরত মুই ধান দেঁও, ভাত দেঁও, কতো আর সাহায্য করা যায় বাহে, দেখো তাকায়া, ঘরগুলাত কী আছে, টাটির বেড়া ভাঙা, চালত খ্যাড় নাই, শীতের মইধ্যে জারে হ্যালে অবস্থা কেরাসিন।'

'ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ আর হয় না? রাস্তা তো দেখলাম মাটি কেটে বড়ো হয়েছে?'

'হয়, গম তো বেচ্যা দেয়। অল্প কিছু কাম হয়। মোল্লাবাড়ির ছোটো বেটা হাশেম মোল্লা, গমমেন্ট পার্টি করে, অরাই কাম পাছে, গম পাছে, টাউনত বাড়ি বানাইছে—গরিম মানুষের আর কী?'

যাদের কাছে জমি আদি দেয়া সেই পূবপাড়ার কাসেম এলো নাটকীয় ভঙ্গিতে, এসেই হাউমাউ করে কান্না দিলো জুড়ে— না খায়া মরিম বাহে না খায়া মরিম, এতো ট্যাকা খরচ কর‍্যা ইরি প্রজেক্ট করনু, পানি দিতেছোঁ ত্যাল খরচ কর‍্যা, অক্ত পানি কর‍্যা ট্যাকা খরচ কর‍্যা, গাছ বেচ্যা; ক্ষ্যাতের অবস্থা দেখ্যা আসো, সার না পায়া খ্যাত জালা জালা; কী ধানগাছ হওয়ার কতা কালা কালা, হলদা হয়া যাতিছে, বিশ হাজার টাকা লোকসান, মুই গলাত দড়ি দিম', সে হাউমাউ করে কাঁদছে।

হামেদালি বললো, 'আর কন না বাহে আর কন না, সার আছিলো দুইশ ট্যাকা, তারপর হইলো বাহে তিনশ, চাইরশ, ছয়শ, তারপর মংগা কয় মংগা, পাওয়া গেলে না দাম—পাওয়াই যায় না।'

ঐ কৃষকদের আলাপের বিষয় গেলো পাল্টে, কোন নেতার কাছে গেলে সার পাওয়া যেতে পারে, না না, তার কাছে গিয়ে টাকা দিয়েও লাভ হয়নি, কার কার প্রজেক্টের বারোটা বাজলো, পূবপাড়ার ধলামিয়া পাগল হয়ে গেছে সার সার করে, কাল হাটে ন্যাংটো হয়ে নেচেছে বুড়ো—সার কোন্টে সার কোন্টে, জমায়েত বিশাল বড়ো হয়ে গেলো— সার সার করে পুরো গ্রাম যেন কারবালা। আবিদুর রশিদ বোঝার চেষ্টা করলেন—গ্রামে ইরির প্রজেক্ট হয়েছে; রাজশাহী উন্নয়ন ব্যাংক বা গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে ঋণ নিয়ে ডিপটিউবওয়েল বসেছে অনেকগুলো। সমস্ত ক্ষেতে ক্ষেতে এখন ইরি আর ইরি, ইরি চাষে নগদ টাকা লগ্নী করতে হয়, গাঁয়ের কৃষকের রক্ত পানি করা টাকা। এখন যখন ইরি ক্ষেতে দেয়া দরকার সার, হঠাৎ করে তা হয়ে উঠলো আক্রা।

'না খায়া থাকা নাগবে বাহে, বছরের খোরাকি আর হইল না'—আসন্ন নিরন্ন-কালের কথা ভেবে নিশ্চুপ হয়ে গেলো জমায়েত।

জমি বেচার কথা উঠলো, আড়ালে-আবডালে গিয়ে ফিস ফিস করলো কেউ কেউ আবিদুর রশিদের কানে কানে, বললো, বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা করে বিঘা, পাঁচ বিঘায় লাখ খানেক টাকা তো হবেই।

কিন্তু জমির ক্রেতা দিনে দিনে মিললো না, নগদ টাকা কারো কাছে নেই, সবাই যার যার সাধ্য মতো ইরির প্রজেক্টে বিনিয়োগ করেছে, চোখের সামনে সেই সব গাছ দুবলা হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সবার মাথায় আগুন।

ভরসা কেবল জমির সরকার, তার ছেলে গেছে আরব দেশে, তাদের এখন কাঁচা টাকার গরম; কিন্তু জমির সরকারের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে দিয়েও কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া গেলো না।

হামেদালি খবর দিলো, 'আপনে বেশি দিন থাক্যা দেখ্যা শুন্যা জমি বেচতে পারবেন না জান্যা সবাই ঘোঁট পাকাছে; পানির দামে জমি কেনার ফন্দি।'

আবিদুর রশিদ চোখে-মুখে অন্ধকার দেখলেন। বিকেলে গোবিন্দগঞ্জ থেকে এলো ভাস্তে আব্দুর রব, সে ওখানে কাঠ চেরাইয়ের ব্যবসা করে দালান তুলেছে, স' মিল আছে। আব্দুর রবকে ঘরে ডেকে বুঝিয়ে বললেন আবিদুর রশিদ, সংকটটা। আব্দুর রব বললো, 'চাচা, বাপ-দাদার জমি অন্য মানুষকে কেন বেচবেন, চলেন গোবিন্দগঞ্জ, আমি আপনার অন্য দুভাস্তের সঙ্গে যোগাযোগ করি, জমিটা যাতে আমাদের বংশের হাতেই থাকে, সেই ব্যবস্থা করি।'

কিন্তু আমাকে যে কালই ঢাকা ফিরতে হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে আব্দুর রব সমস্যার সমাধান দিলো, যা হোক কালকে দিনের বেলা করে রাতে আপনাকে তুলে দেবো ঢাকার কোচে। তাই হলো, ওই দিন রাতেই আবিদুর রশিদ চলে এলেন গোবিন্দগঞ্জে, ভাস্তের বাসায়।

আসার সময় হামেদালি খুব কান্নাকাটি করলো, আদিয়ার (বর্গাচাষী) বললো, 'ইরির বেজায় খরচ, কিছু টাকাপয়সা দেন, তেল-সার কিনতে কিনতে পাছামারা গেছে।'

হামেদালির কান্নাটা একটু নাটকীয় পর্যায়ে গেলো।

আবিদুর রশিদ বললেন, 'তুমি চিন্তা করো না, ওই তিনবিঘা আমি তোমাকেই লিখে দিয়ে যাবো। তুমি চলো গোবিন্দগঞ্জে, কালকেই লেখাপড়া করে দেবো।'

জমির দলিলপত্র সব স্টিলের আলমারি থেকে বের করে তুলেছিলেন ট্রাভেল ব্যাগে, মাকে না জানিয়ে, ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললেন আবিদ।

হামেদালি ক্ষেপে গেলো। চিৎকার করে উঠলো, 'জমি দিয়া হামি কী করমো বাহে, হামার দুষ্ক হইল্ গিয়া, তোমরা যদি জমি বেচ্যা যান, আর কি গাঁও-গেরামত আসপেন। আর কি দেখা-সাক্ষাৎ হবি।'

তা ঠিক। তা ঠিক। আবিদুর রশিদ নিজেই কেঁদে ফেললেন।

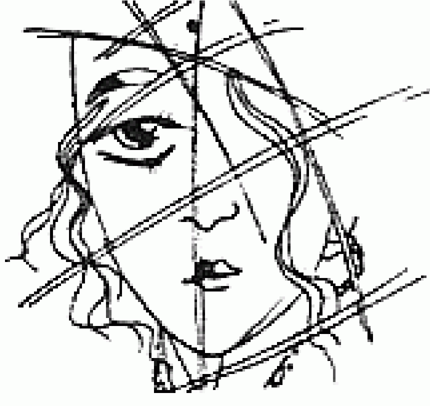
হামেদালির বড় দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দুটো ছোটো ছেলে, আর বউ—তারাও কাঁদতে লাগলো দুজন বয়স্ক মানুষকে কাঁদতে দেখে।

আব্দুর রব বললো, 'ও হামেদ চাচা, কী শুরু করলা কও দেখি, কান্নাকাটি করো ক্যান। ও হো যন্ত্রণা। চলেন চাচা, চলেন। রিকশা এসে গেছে।'

আবিদুর রশিদ সন্ধ্যার সময় বাড়ি ছাড়লেন। রিকশা চলছে, আকাশ লাল-নীল-কালোয় অপূর্ব, দুধারে অপুষ্ট ইরি ক্ষেত, বাঁশঝাড়ে উড়ে এলো কানাবগের ঝাঁক। আর ছেলেপুলের এক বিশাল ঝাঁক আসছে তাঁর রিকশার পিছু পিছু। তাঁর স্মরণ হলো বাবার কবরটা দেখতে যাওয়া হলো না, আর বেজে উঠতে লাগলো হামেদালির কান্না— আর কি দেখা-সাক্ষাৎ হবি?

নগদ চল্লিশ হাজার টাকা বুঝিয়ে দিলো আব্দুর রব, সকাল সকাল উকিল এলো বাড়িতে, রেজিষ্ট্রি অফিসের কাজে খরচ হলো দু'হাজার, আবিদুর রশিদ স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে দিলেন অকম্পিত হস্তে, ষাট হাজার টাকা ধার্য্য হলো জমির দাম, বিশ হাজার টাকা বাকী থাকলো, পরে পাঠিয়ে দেবে আব্দুর রব—এই সাব্যস্ত হলো কথা।

তিন বিঘা জমি হামেদালিকে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হলো না, হামেদালি সেদিন গঞ্জে এলো না; আর আব্দুর রবকে একবার মিন মিন করে বললেন আবিদুর রশিদ, যে, হামেদালিকে গোরস্তানের পাশের জমিটা লিখে-পড়ে দিতে চান; আব্দুর রব প্রায় ধমকের সঙ্গে নিবৃত্ত করলো তাঁকে, 'চাচা, পাগলামি করবেন না তো, পূর্বপুরুষের জমি বংশের মধ্যে রাখেন।' তাতো কথাই বটে, নিজের জমিতো নয়, বাপ-দাদার জমি— যে কাউকে ইচ্ছা করলেই তো তিনি দান করে যেতে পারেন না।



সুজয়নগরের কম্পিউটার শপ, দাম যাচাই করতে, খোঁজ খবর নিতে ঢুঁ দিলো খুকু, সঙ্গে বাবা।

'আসুন, বসুন,' একটা সুসজ্জিত রুমে তাদের বসানো হলো; 'বলুন আপনাদের কী উপকার করতে পারি'— টেবিলের অন্য পাশে বসা এক সুদর্শন যুবক বললো।

'না, মানে, আমরা একটু পিসি দেখতে এসেছি', জবাব দিলো খুকু।

'কিনবেন?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। কী কাজের জন্যে মেশিন কিনতে চান, জানতে পারি?'

কারণটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলো খুকু, মুখ খুললেন আবিদুর রশিদ, বললেন, 'এ হলো আমার মেয়ে খুকু। ও বুয়েটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।'

'ভর্তি হয়েছি, ক্লাস শুরু হয়নি', তাড়াতাড়ি তথ্য সংশোধনী দিলো খুকু।

'ও, গুড নিউজ। কংগ্রাচুলেশন্স', বললো যুবক।

'থ্যাংক ইউ।'

দুটো সেভেন আপের বোতল এলো। 'না না, এসবের কী দরকার, আমরা আসলে দেখতে এসেছি, কিনতে আসিনি', বললো খুকু।

তারা জানে না, কতো শক্ত সেলসম্যানের পাল্লায় পড়েছে তারা। ইন্টারকমের ফোনটা তুলে যুবক কথা বললো অন্য কারো সঙ্গে।

এবার ঘরে ঢুকলো এক তরুণ; তার গায়ে হালকা আকাশি শার্ট, পরনে নীল জিন্সের প্যান্ট, পায়ে কালচে খয়েরি বুট, বেল্টটাও একই কালারের, ছেলেটার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা, খুব বেশি ফর্সা— খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো খুকু।

টেবিলের অপর পার্শ্বে বসা যুবক বললো, 'শুভ্র এঁরা একটা পিসি মনিটর কিনতে চান। ইনি তোমাদের বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন।'

'পড়ি না, ভর্তি হয়েছি'— আবার সংশোধনী দিতে হলো খুকুকে।

'আমার নাম অনিল শুভ্র। আপনি?'

'আমি? সায়েমা আক্তার। ডাকনাম খুকু। ইনি আমার বাবা।'

'স্লামালেকুম'—বিটিভি স্টাইলে সালাম দিলো শুভ্র।

'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'আপনি বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছেন। আমি বুয়েট থেকে গতবছর বের হয়েছি, ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে। সিনিয়রিটির সেই অধিকারে আপনাকে আমি কিন্তু বলবো তুমি করে।'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখো। নানা রকমের মেশিন আছে। কোনোটা কালার মনিটর, কোনোটা সাদাকালো।

এগুলো অ্যাপেল্, এগুলো আইবিএম।'

'আমরা তো এসব যন্ত্রপাতি কখনো ব্যবহার করিনি', বললেন আবিদুর রশিদ।

'কেউই এর আগে করেনি আংকেল। এটা তো এ যুগের যন্ত্র! আগের কালের মানুষ যেমন রেডিও টিভির সুইচে হাত দিতেও ভাবে জ্ঞান দরকার। তাতো না। পিসি হলো তেমনি জিনিস। পারসোনাল কম্পিউটার। একদম ফ্রেন্ডলি যন্ত্র। মানুষের বন্ধু। সবাই ইউজ করতে পারে। আপনি পারেন, আমি পারি। আপনার হিসাব রাখবেন, চিঠিপত্র লিখবেন আর মাঝে মধ্যে খেলবেন।'

খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'কী কী গেম আছে?'

শুভ্র বললো সেল্‌সম্যানের কায়দায়, 'কী খেলতে চান? হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা। হা-হ-হা। দাবা, বিলিয়ার্ড, কার্ড, কার রেসিং, কতো কী?'

একটা কম্পিউটার দেখিয়ে শুভ্র বললো, 'খুকু, এসো এই কালার মনিটরটা ওপেন করো।'

কম্পিউটারের মাউস এগিয়ে দিলো সে। কী করতে হবে, খুকু ঠিক বুঝলো না। শুভ্র দেখিয়ে দিলো, 'এই জায়গায় চাপ দাও। পরপর দুবার ক্লিক করো।'

খুকু হাত দিলো মাউসে। শুভ্র তার হাতের ওপরে হাত রেখে দুবার চাপ দিলো। খুলে গেলো কম্পিউটারের পর্দা। ওয়েলকাম টু দি ম্যাকিনটোশ।

খুকুর হাত থরথর করে কাঁপছে, শুভ্র বুঝলো। সে তার খুব কাছে বসে থাকা মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো এক ঝলক। এতো কাছে, এতো কাছে।

দেখলো, মেয়েটির নাক ঘেমে গেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম, পদ্মপত্রে নীর।

রুমে এয়ারকুলার আছে।

শুভ্র বললো, 'নার্ভাস হচ্ছো কেন, খুকু, পিসি হলো খুবই ফ্রেণ্ডলি যন্ত্র। আর সেল্‌সম্যানরা হলো খুবই ফ্রেণ্ডলি মানুষ। একটা কম্পিউটার বিক্রি করলে আমরা বাসায় গিয়ে ইনস্টল করে আসি, সাত দিনের ফ্রি ট্রেনিং দেই, এক বছরের গ্যারান্টি দেই- এর মধ্যে কোনো গোলযোগ হলে মেশিন সারিয়ে দেই, বদলে দেই।'

খুকুর মনে হলো, সে বলে, নার্ভাস যন্ত্রের কারণে হইনি, হয়েছি মানবযন্ত্রের ছোঁয়ায়। বাবা না থাকলে ভালো হতো, কে জানে কেন খুব লজ্জা লজ্জা লাগছে।

কম্পিউটার শপ থেকে বেরিয়ে তারা গেলো আরেকটা কম্পিউটার ডিলারের অফিসে। পিসি দেখলো বিভিন্ন রকম। দাম মিলিয়ে দেখলো। কতো ধরনের কম্পিউটার, তাদের কতো ধরনের দাম। তবে দুই দোকান মেলালে দেখা যায়— দাম এক দম এক। খুকু বললো, বাবা, সব মনে হচ্ছে একই দাম; তাহলে আর ঘুরে লাভ নেই। প্রথমটা থেকেই নেই।

আবিদুর রশিদেরও পছন্দ হয়ে গেছে অনিল শুভ্রর ব্যবহার । তিনি বল্লেন, চল্ শুভ্রের দোকানেই যাই। খুকুর হাত ব্যাগের মধ্যে রাখা শুভ্রর ভিজিটিং কার্ড, অনিল শুভ্র, সফ্‌ট ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কম্পিউটার শপ...... ফোন নং ---।

খুকু উঠেছে খুব সকালে, রাতে তার ভালো করে ঘুম হয়নি। একটা বিছানায় সে আর বাবু শোয়, দাদিআম্মা শোন আলাদা বিছানায়, একই ঘরে। সারারাত আজ তার ঘুম ভালো হয়নি, সে জেগে জেগে উঠেছে, রাতে ঘুম আসতেও দেরি হয়েছে বেশ; খুকু ভেবেছে, আহা আমার যদি একটা রুম থাকতো, একেবারেই আলাদা একটা রুম, সেই ঘরটাকে আমি সাজাতাম পুরো নীল করে, তার দেয়ালে থাকতো হালকা নীলরঙ, পর্দা হতো হালকা আকাশি, যেন একটুকরো চার কোণা আকাশ, সেই রুমে কোনো খাটপালঙ্ক থাকতো না, সব কিছু থাকতো মেঝেয়।

একটা নীলচে ধূপছায়া রঙের ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট থাকতো সেই রুমে, রুমের মেঝেয় থাকতো কতোগুলি শাদা কুশন, মনে হতো নীল পানিতে সাঁতার কাটছে কতোগুলো শুভ্র হাঁস।

কম্পিউটারটা বসানো হতো কোথায়? ডেস্কটপ কম্পিউটার, ওতো একটা ডেস্কেই বসাতে হবে, না হলে কী বোর্ড থাকবে কোথায়, মনিটর থাকবে কোথায়। আর সে বসবে কোথায়। তার ভাবনাটা গেলো গুলিয়ে।

একটা ম্যাকিনটোশ ক্ল্যাসিক কম্পিউটার এই ঘরেই বসানো হয়েছে, খুকুর পড়ার টেবিলে; তার ওপরে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে একটা পাহাড়ি জলপ্রপাতের পোষ্টার, খুবই কমন একটা পোষ্টার, ওনলি দি লোনলি, একটা মেয়ে বিশাল প্রকৃতির মধ্যে ঘাসের ওপরে বসে আছে ঘাড় গুঁজে। মাথা নিচু করে।

শুভ্র ভাইয়া কি পোষ্টারটা দেখেছে? খুকু ভাবে।

বাবুটা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবনায় ছেদ পড়েছে খুকুর, তখনই তার মনে হয়েছে — আহা ভাবনার জন্যেও চাই একটা একান্ত ঘর, সাঁতরাবার জন্যে চাই একান্ত পুকুর আর ভাসবার জন্যে চাই একটা নিজস্ব আকাশ।

মেশিনটা এ ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেছে শুভ্র, সঙ্গে দুজন কর্মচারী এসেছিলো কম্পিউটার শপ থেকে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে, দশটায় শুভ্র ভাইয়া আসবেন। ট্রেনিং-ক্লাস নিতে।

খুকুর অস্থির লাগছে, সে উঠে পড়লো, চোখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিলো অনেকক্ষণ।

সে গেলো বারান্দায় তাদের টিয়া পাখিটার কাছে। পানি বদলে দিলো খাঁচার, পরিষ্কার করলো নোংরা হাবিজাবি, দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায় গিয়ে আকাশের খোঁজে, আকাশ নেই, বাড়িটা নিচতলা, অন্ধকার; ভূতের গলির ভেতরে উপগলিতে।

বাথরুমে ঢুকে ভোরবেলা খুকু গায়ে ঢাললো ঠান্ডা পানি, বাথরুমে কোনো আয়না নেই, বেসিনের আয়না আছে বাইরে; একটা আয়না থাকলে কেমন হতো, ভোরবেলা ভাবতে লাগলো খুকু, নিজের শরীর নিয়ে সে কোনো দিনই তেমন করে ভাবেনি, যতোটা গভীরভাবে মত্ততার সঙ্গে করে গেছে পড়াশুনা।

আজ তার মনে হলো, তার রঙটা যেন তেমন উজ্জ্বল নয়, একটু চাপা, আর ফিগারটাও আরেকটু ভারি হতে পারতো, বড়ো হালকা সে, পাখির পালকের মতো।

শুভ্র আসবে দশটায়, কী জানি সাড়ে ন'টাতেও এসে যেতে পারে, ঘরটা একটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখা দরকার, দাদিআম্মা উঠে পড়েছেন, নামাজ পড়ছেন, বাবুকে তোলা দরকার। ড্রেসিং টেবিলটাতো এই ঘরেই—শুভ্র এসে গেলে তো আর তার সামনে বসা যাবে না। আলমারিটা ওই ঘরে, বাবা-মার ঘরে, কী পরবে আজ সে? কাপড়-চোপড়ও বেশি নেই তার, ঠিক আছে, মাস্টার্ড কালার জামাটা পরলে তাকে উজ্জ্বল দেখায়।

খুকু বসেছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে, সকালবেলায় শ্যাম্পু করায় চুলগুলো বেশ দেখাচ্ছে—রেশমি কোমল ঝলমলে—নাহ, আমি দেখতে খারাপ নই, নিজেকেই বললো খুকু নিজে।

বাবুর স্কুল ডে শিফটে, এগারোটায় শুরু হয়, ও দশটাতেই বেরিয়ে যায়, বাবুটা গেলে বাঁচা যায়। কিন্তু তার আগে তার পাকা পাকা কথার ঘা সম্ভবত সহ্য করতে হবে। আশঙ্কা পরিণত হলো সত্যে, বাবু এসে বসলো পাশের বিছানায়, বললো, 'কী ব্যাপার আপা, তুমি এতো সাজগোছ করছো কেন? কোথাও বের হচ্ছো?'

'না।'

'ও বুঝেছি। শুভ্র ভাইয়া আসবেন। তোমার কম্পিউটার ক্লাস শুরু হবে। আপা এই ক্লাস করার জন্যে এতো সাজার কী দরকার?'

'পাকা পাকা কথা বলবি না বাবু, চড় খাবি।'

'আমার মনে হয় আপা কম্পিউটারটার জন্যে তুমি সাজছো না। কারণ এটা রোবট নয়। আপা জানো, আমি একটা বই পড়েছি, তিন রোবটের কাণ্ড, সেটায় একটা ছেলে রোবট একটা মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটা কিন্তু রোবট নয় আপা, মানুষ।'

'এই সব বই পড়ে পড়ে তোর মাথাটা গেছে বাবু।'

'মাথা যে যায়নি তার একটা প্রমাণ দেই আপা। তুমি এতো সেজেছো, এর কারণ শুভ্র ভাইয়া আসবেন।'

'মা।' খুকু চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার এই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ছেলেকে সামলাও।'

'মাকে ডাকতে হবে না আপা। আমি নিজেই নিজেকে সামলাচ্ছি। আমার স্কুল আছে। আপা, একটা চুইংগামের প্যাকেট কিনে দেবে।'

'চুইংগাম খেলে দাঁত নষ্ট হয়।'

'কী যে বলো তুমি আপা। টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখোনি। সব স্মার্ট স্মার্ট প্লেয়াররা চুইংগাম খায়।'

'স্মার্ট তো তুই যথেষ্টই'। আজ সারা সকালে এই প্রথম হাসলো খুকু। বললো, 'মাই ডিয়ার স্মার্ট ব্রাদার। লুক, চুইংগামের দাম তুই পাবি, আগে বলতো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

বাবু চোখ তুলে তাকালো।

খুকু শাড়ি পরেছে টিয়া রঙের শাড়ি; সবুজ শাড়ি, সবুজ টিপ, সবুজ ব্লাউজ, কী যে সুন্দর লাগছে আপাকে।

'আপা তোমাকে না ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো লাগছে। কী বলবো আপা। খুব সুন্দর। খুব সুন্দর।' বাবুর কণ্ঠে সত্যিকার মুগ্ধতা।

'ব্যাগটা দে।' দশটাকার একটা নোট বের করে দিলো খুকু, ভাইয়ের হাতে।

খুকুর অস্থির লাগছে, সে বসে আছে ড্রয়িংরুমে, বার বার ঘড়ি দেখছে, দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকী, শুভ্র আসছেন না কেন?

কেমন বুদ্ধিমান ছেলেটা। আর কেমন ধবধবে শাদা, সরল শিশুর মতো মনে হয়।

কলিং বেল বেজে উঠলো। খুকুর বুকের ভেতরটায় বেজে উঠলো দুন্দভি; সে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়লো, এগিয়ে গেলো কম্পিত পায়ে। দরজায় শুভ্র।

শুভ্র বললো, 'মোটর সাইকেলটা বাসার সামনে রেখেছি, থাকবে তো!'

শুভ্র আর খুকু এলো খুকুর ঘরে। কম্পিউটার অন করে খুকুকে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলো শুভ্র। এমএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু। তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। খুকু মন দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করলো।

শুভ্র বললো, 'অতো মনোযোগী ছাত্রীর মতো সব কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই। তোমার ঘরে আছে, রোজ একটু আধটু সময় দিলেই সব আপনা আপনি মনে থাকবে। বুঝলে?'

'জ্বী আচ্ছা।'

'জ্বী জ্বী করছো কেন? আমি তো টিচার নই। এমন ভাব করছো যেন আমি টিউশনি করতে এসেছি। একটু পরে এককাপ চায়ের সঙ্গে একটা নাবিস্কো বিস্কিট। হা- হা- হা-'।

হাসলে পড়ে শুভ্রর গালে টোল পড়ে, খুকু দেখলো।

'খুকু, তোমরা ক ভাইবোন?'

'এক ভাই, এক বোন।'

'ভাই কি ছোটো না বড়ো?'

'ছোটো?'

'তার নাম কি বাবু?'

'হ্যাঁ। কী করে জানলেন?'

'শোনো তুমি বাবা-মার বড়ো মেয়ে। প্রথম সন্তান। তোমার নাম খুকু। এর মানে হলো বাবা-মা তোমার জন্যে অনেক ভালো ভালো নাম খুঁজেছেন। কোনো নামই আর পছন্দ হয় না, রাখি রাখি করেও আর রাখা হয় না। ফলে তোমার ডাকনাম হয়ে গেলো খুকু। সবাই তো খুকু বলেই ডাকতো। একই ঘটনা ঘটলো তোমার ছোটো ভাইয়ের বেলায়। বাবা-মার একমাত্র ছেলে, খুবই আদরের। কী নাম রাখা যায়, কী নাম রাখা যায়, সবাই ডাকে বাবু বলে। শেষে নাম হয়ে গেলো বাবু।'

খুকু মন দিয়ে শুনলো শুভ্রর যুক্তি। বাহ্ লোকটা তো বেশ বুদ্ধিমান।

শুভ্র দেখলো এক বৃদ্ধা দরজায় পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবতঃ পাহারা দিচ্ছেন দুজন মানব-মানবীর একলা ঘরে থাকার এই ব্যাপারটিকে। শুভ্র বললো, 'উনি কে হন? নানি?'

'না, দাদিআম্মা।'

শুভ্র গলা বাড়িয়ে বললো, 'দাদিআম্মা, বাইরে কেন, ঘরের ভেতরে এসে বসুন।'

দাদিআম্মা লজ্জা পেয়ে গেলেন। শুভ্র বললো, 'আসুন না প্লিজ, আপনাকে একটা গান শোনাই।'

দাদি ভেতরে এলেন, দাঁড়ালেন শুভ্র আর খুকুর পেছনে। শুভ্র চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কম্পিউটারে নতুন একটা ডিস্কেট ঢুকিয়ে এটা ওটা টিপতে লাগলো। মিউজিক বেজে উঠলো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসির সুরে।

দাদি খুকুর কান ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসুদ রানা পড়া দাদি বললেন, 'জাতীয় সংগীত বাজার সময় দাঁড়াতে হয়। এটা হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমটা হলো আসল। এই যে মাসুদ রানা এতো নাম করেছে, তার মূলে কিন্তু তার দেশপ্রেম।'

স্বপ্নের মতো কেটে গেলো একটা সপ্তাহ, কম্পিউটারের ফ্রি ট্রেনিং পিরিয়ড; এই সাতদিনে খুকু বহু কিছু শিখে ফেলেছে, সে কম্পোজ করতে পারে বাংলা আর ইংরেজিতে, ছবি আঁকতে পারে ম্যাকপেইন্টে, এক্সেল প্রোগ্রাম শিখে ফেলেছে। আর একটা প্রোগ্রাম দিয়েছে তাকে শুভ্র — সার্কিট ড্রয়িং-এর ওপরে।

কম্পিউটার যন্ত্রটা প্রথম প্রথম টানে নেশার মতো, খুকুর দিনগুলো চলে গেলো পাখাঅলা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে।

আজ শেষ দিন, সপ্তম দিবস।

'আজ তো শেষদিন ট্রেনিং-এর। তুমি বেসিক জিনিসটা শিখে গেছো খুকু', শুভ্র বললো। 'ঘন্টা শিখেছি', খুকু জিভ ওল্টালো।

'ঘন্টার বেশি শিখলে তো সমস্যা। আমি হলাম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আর তুমি হলে গিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ঘন্টার বেশি যদি কিছু এখনই শিখে ফেলো, বুয়েটের চার বছরে তুমি কী শিখবে?'

খুকুর মুখে আর কথা যোগাচ্ছে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, 'আপনি কালকে আর আসবেন না?'

'আসাটা কি উচিত হবে? আমি হলাম সেল্‌সম্যান। মেশিন বিক্রি করেছি, ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং হয়ে গেছে। এবার আমার কর্তব্য শেষ।'

'ও'। খুকু আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর বললো, 'আর যদি আমি আপনাকে আসতে বলি?'

'কার ঘাড়ে দুটো মাথা। আমাকে আসতেই হবে। ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দেয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।'

'ও, শুধু কর্তব্য আর দায়িত্ব,' 'খুকু আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলো' 'ঠিক আছে। আপনি যান। এখনি। আপনাকে আর কর্তব্য করতে হবে না।'

শুভ্র উঠলো, যেন ক্লায়েন্টদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলা, সম্পর্কের অতিরিক্ততা তার জন্যে খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার—এমনি ভাব দেখিয়ে।

শুভ্র চলে যাচ্ছে, বাইরে মোটর সাইকেলের স্টার্ট নেবার আওয়াজ হচ্ছে। খুকু বসে আছে স্তম্ভিতের মতো, তার মস্তিষ্কের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ভট ভট শব্দ।

হাসনা বেগম এলেন ট্রেতে চা নিয়ে।

দেখলেন, মেয়ে একা।

'শুভ্র কোথায়?'

'চলে গেছে।'

'চলে গেলো। কিছু খাওয়ালি না?'

'খাওয়াবো কেন? সেলস্‌ম্যান। পয়সা নিয়েছে, জিনিস বেচেছে। মিটে গেছে। ব্যস।'

মেয়ের আচরণ হাসনা বেগমের কাছে বোধগম্য হলো না। একটা ছেলে শেষ দিনে না খেয়ে চলে যাবে? তাঁর ইচ্ছা ছিলো আজ রাতে ছেলেটাকে খেয়ে যেতে বলবেন। পোলাও-টোলাও রাঁধা হবে, দু'টো মুরগি তিনি সেজন্যে আনতে দিয়েছেন আবিদুর রশিদকে।

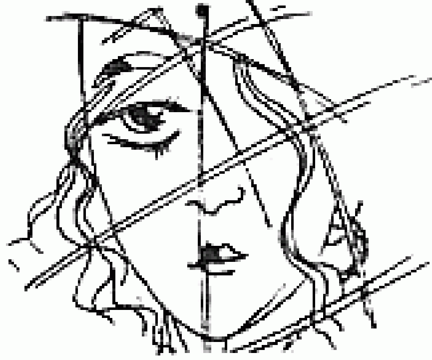
খুকু নিজের ঘরে গেলো। পোষ্টারটার দিকে চোখ গেলো তার। ওনলি দি লোনলি। পাহাড়ের গা থেকে পানি ঝরছে, বিশাল চরাচরে মেয়েটি একা। আর তার বুকের অনেক অনেক দুঃখ, না বলা কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঝরছে পাহাড় থেকে। জলপ্রপাত।

খুকুর চোখ ভেঙে এলো কান্না। কণ্ঠস্বর উথলে উঠলো কান্না। সে তাড়াতাড়ি তার বিছানায় উপুড় হলো। দাদিআম্মা বাথরুমে। বাবু স্কুলে। ঘর ফাঁকা। কান্নার উপযুক্ত পরিবেশ। দমকে দমকে উঠছে কান্না। খুকু কেঁদেই চললো। কাঁদতে তার খুবই ভালো লাগছে।

প্রিয় পাঠক, আমাদের এই গল্পটিকে আমরা এখন একটা জায়গায় আনতে সক্ষম হয়েছি, যে, এখন এক অষ্টাদশী তরুণী, বালিকা মুখ গুঁজে কাঁদছে, তার পিঠ উঠছে নামছে; তাহলে এখন, পাঠক আপনি সাক্ষ্য দেবেন যে, প্রকাশকের অনুরোধ রক্ষা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি, আমাদের গল্পে প্রেম-ভালোবাসার দৃশ্য যুক্ত করতে পেরেছি। খুকু কাঁদছে, ওকে কাঁদতে দিন, এই কান্নাটাও খুব মূল্যবান; এমন একটা কান্না কাঁদার জন্য আমাদের কতো তরুণ, কতো তরুণী, কতো বালক, কতো বালিকা, কতো মানুষ , কতো মানুষী দিনের পর দিন অপেক্ষা করে, কান্না আসে না।

এক্ষণে খুবই ভালো হয়, যদি একটা রবীন্দ্রসংগীত বেজে ওঠে, কোথাও চরাচরের কোনো শূন্যপ্রান্তরে, না হলে বাজবে কারো অন্তরে –

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শুন্য পথপানে,
কাহার জীবনে, নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে
পড়নি কাহার নয়ানের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে –
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।



বাবু ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরসবদনে। সে একটা নতুন ম্যাজিক শিখেছে। দিয়াশলাইয়ের বাক্সভরা কাঠি থাকবে। তারপর ছু মন্তর ছু বলতেই বাক্স শূন্য, কাঠি নেই। ব্যাপারটা খুবই সোজা। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের ভেতরে যে একপাশ খোলা বাক্সটা থাকে, তার নিচের দিকটা খুলে রাখতে হয় কবাটের মতো। আঙুল দিয়ে গুঁতো দিয়ে একবার

দেখাতে হয় কাঠি ভর্তি বাক্স, আরেকবার আঙুল সরিয়ে কাঠিগুলোকে নিচে নামতে দিয়ে দেখাতে হয় খালি বাক্স। এই যাদুটা সে শিখে এসেছে স্কুল থেকে। আপাকে দেখানো দরকার। কিন্তু আপার মনমেজাজ মোটেও সুবিধের মনে হচ্ছে না।

মিঠুকে নিয়ে উত্তেজনাও তার শেষ হয়ে গেছে। ম্যাজিসিয়ান হতে পারার সাধনায় সে এখন পুরোপুরি আত্মোৎসর্গীকৃত। ঠিক করেছে জুয়েল আইচের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

খুকু তার বিছানায় শুয়ে আছে, গলা অবধি কাঁথা দিয়ে ঢেকে। বেলা বাজে ১০টা। আজ বাবুর স্কুল বন্ধ। খুকুর বিছানার পাশে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার, ছোটো। গান বিষয়টা যে শোনার, খুকু উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে সব মনের কথা লেখা। গান বাজছে –

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়।
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে এরা চায়।

আর বিছানায় ছড়ানো-ছিটানো কবিতার বই, বাবার বইয়ের র‍্যাক থেকে পাড়া।

বাবু বললো, 'আপা, তুমি এসব কী গান শুনছো। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমি তোমাকে ভালো গান এনে দেবো।'

খুকু তেমন উৎসাহ দেখালো না।

বাবু বললো, 'গানটা হেভি। লেটেষ্ট। শুনবে?

তু তু তু তু তারা............।

চড় খাবি বাবু। সবসময় ডিস্টার্ব ভালো লাগে না।

অল্প বয়সী মেয়েদের প্রিয় কবিতা দাঁড়ায়— কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনা। খুকুরও দাঁড়ালো।

বাবু বললো, 'আপা, তোমার গানের মধ্যে খারাপ কথা আছে। আমার বন্ধু মৈনাক বলেছে, প্রেম হলো খারাপ কথা।'

খুকু বাবুকে বললো, 'কাছে আয়।' বাবু এলো। খুকু ওর কান ধরে বেশ জোরেই মলে দিলো।

বাবু ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে উঠলো। সে কক্ষ ত্যাগ করে গেলো মার কাছে বিচার দিতে।

খুকুর আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আসলে তার এখন কোনো কিছুই করতে ই.চ্ছ করছে না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হচ্ছে কেন – সেই কারণটাই সে ধরতে পারছে না। কী জানি কাহার তরে মন করে হায় হায়।

খুকু উঠে বসলো গিয়ে চেয়ার টেবিলে। কম্পিউটারের সুইচ অন করলো। দেখতে পেলো একটা ডিস্কেটের নাম শুভ্র। সেই ডিস্কেটটা সে ঢোকালো কম্পিউটারে, মাউসে দুবার ক্লিক করতেই খুলে গেলো শুভ্র নামের ফাইল।

পর্দা জুড়ে ভেসে উঠলো লেখা –

'খুকু'

যদি তোমার মনে হয় শুভ্রকে দরকার, নির্দ্বিধায় ফোন করো ৪১৩২৩২. চলে আসবো ।'

খুকুর বুক কাঁপতে লাগলো, সে বাবুকে নিয়ে এলো কাছে, বললো, 'লক্ষী ছোটো ভাই, আয়, দুজনে একটু বাইরে যাই, তোকে চুয়িংগাম কিনে দেবো, কম্পিউটারে গাড়ি চালাতে শেখাবো, চল যাবি।'

বাবু বেশিক্ষণ আপোসহীন অভিমান পুষে রাখতে পারলো না। কারণ যাদুটা দেখানোর জন্যে তার পেট ফেটে যাচ্ছে। সে বললো, 'চলো।'

তারা গেলো পাড়ার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে। ডিজিটাল টেলিফোন সেট। প্রতিকল চারটাকা। ৪১৩২৩২। ফোনের ডিজিট টিপতে গিয়ে খুকুর মনে হলো–সারা শরীর এতো অবাধ্যের মতো কাঁপছে কেন?

'হ্যালো, কম্পিউটার শপ? অনিল শুভ্র কি আছেন?'

'খুকু?'

'হ্যাঁ?'

'আমি ফোনের কাছেই ঘুর ঘুর করছিলাম। আমি জানতাম তুমি ফোন করবে। কী চলে আসবো?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি।'

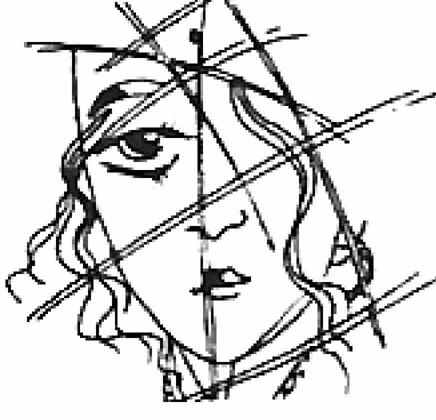
বাবুকে একটা চুয়িংগাম কিনে দিতে হলো। দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই বাবু বের করলো, 'আপা, দেখো, তো ম্যাচে কাঠি আছে কি নেই?'

'আছে।'

'ছু মন্তর, ছু মন্তর, ছু মন্তর, দেখো সব উধাও।'

খুকু ছোটোভাইকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'দারুণ।'

শুভ্র অফিসে বললো, ক্লায়েন্ট কমপ্লেইন। উঁহু। মানুষ যে কম্পিউটারকে কেন এতো ভয় পায়, সামান্য সমস্যাতেই ডাকাডাকি। এখন থেকে ডাক্তারদের মতো ভিজিট নিতে হবে। প্রতি কল পাঁচশ টাকা। লেকচার দিতে দিতেই সে বেরিয়ে গেলো অফিস থেকে, স্টার্ট দিলো মোটর সাইকেলে, হাতিরপুল মোড়ে এসে দেখলো গভীর ষড়যন্ত্র, অমোচনীয় যানযট।



হামেদালি সকালবেলা দাঁতনটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছে ক্ষেত দেখতে। তার নিজের জমি দুই বিঘা, সরকারদের জমি আদি করেন তিন বিঘা; পাঁচ বিঘাতেই তার এবার ইরি। ইরি করতে অনেক টাকা-পয়সা লাগে; তার হাতে নগদ টাকা তেমন ছিলো না, বউয়ের একটা গলার হার ছিলো, সেটা বেচেছে দেড়হাজার টাকায়। বউটা খুব কান্নাকাটি করেছিলো গয়না হারানোর শোকে। হামেদালি বুঝিয়েছিলো ধান উঠলে তো দেড়হাজার টাকা নয়, পুরো তিন হাজার টাকায় আরেকটা ভারি গলার হার গড়ে দেবে। ধান না হবার কোনো কারণ নেই। ইরির প্রাণ হলো পানি। ইনশাল্লা পানির অভাব নেই। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে, তার জমিগুলো সেই প্রজেক্টের মধ্যে পড়েছে।

ইরি ক্ষেতে যেমন খরচ, তেমনি পরিশ্রম। সকালসন্ধ্যা তাকে খাটতে হচ্ছে। তা সে খাটতেই পারে। খাটুনিতে তার কোনো অসুবিধা নেই। দুচারজন কামলাও খাটাতে হচ্ছে নগদ টাকায়। কিষাণদের হয়েছে পোয়াবারো। আগের দিনে তাদের এলাকায় ছিলো মামুর কিষাণের চল। যার কাটামারি থাকতো, সবাই মিলে যেতো তার বাড়ি, যেন যাওয়া হয়েছে মামাবাড়ি। পেটভরে গোশ্‌ত ভাত, লাউ। সবাই মিলে ধরে দিনে দিনে পুরো ক্ষেতের ধান কেটে দেয়া। এখন সে দিন নেই। কামলা-কিষাণেরা কথাই বলতে চায় না নগদ পয়সা ছাড়া।

ক্ষেতের আ'লে গেলো হামেদালি, তার কলজেটা শুকিয়ে এলো ক্ষেতের অবস্থা দেখে। একী হাল। হায় হায়। পাতা শুকিয়ে লালচে। অথচ পানির কোনো অভাব নাই। কোনো রোগ-শোক নাই। ফিল্ড সুপারভাইজার বলে গেছেন, সার দিতে হবে। কৃষকরা সবাই জানেও সে নিয়ম। এখন দরকার সার। দিতে পারছে না তারা। হামেদালি ধানগাছের গায়ে হাত বুলোয়। তার মনে হয় যেন নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধের অভাবে খিদেয় কাঁদছে, কিন্তু তাকে দুধ দেয়া হচ্ছেনা। মাথায় বজ্রপাত ঘটতে থাকে। কী করা! কী করা!

'কী বাহে, সারের ব্যবস্থা কিছু করবার পারনেন?' পাশের ক্ষেত থেকে চিৎকার ভেসে উঠলো। খোঁড়া বশির।

'না বাহে, কাইলকা হাটত গেছি, সারের চিন নাই।'

'গোবিন্দগঞ্জ আইজকা ডিলারঘরে গোডাউনত সার আসবার কথা আছে, শুনছেন কিছু?' খোঁড়া বশির জিজ্ঞেস করলো।

'না বাহে, মুই তো কিছু শোনোম নাই। তাইলে তো যাওয়া নাগে গঞ্জত'–দেরি না করে হাঁটা ধরলো হামেদালি।

খোঁড়া বশির বললো, 'সগিরক কছি যাবার, ট্যাকা দিছি, তাঁয় যাবার চাইছে, যান বাহে, তোমরাও যান।'

হামেদালি বাড়ির দিকে হাঁটছে, পেছন থেকে ভেসে আসছে খোঁড়া বশিরের গলা–'এবার সার না পাইলে আর বাঁচা নাগবার নয়, মুই গলাত দড়ি দেমো।'

হামেদালি বাড়ি গিয়ে ছয়শ টাকা বের করলো তোরঙ্গ থেকে, বউকে ডেকে বললো, 'গঞ্জত নাকি আইজকা সার আসপে, মুই গেইনো, সান্ঝের বেলে ফেরমো।'

ছেলে দুটো ঘিরে ধরলো পথে। 'বাপো, গঞ্জত থাক্যা কী আনমেন? জিলাপি আনমেন ?'

হামেদালি বললো, 'সার পালে বাপধন মিঠাইমন্ডা সোগ পাবা, সার না পালে কী হবি, ভাবচো।'

বালকদ্বয়ের তা ভাবার বয়স নয়, তবে চারদিকে যে রব উঠেছে, তা তাদেরও কানে গেছে, সারের খুবই আকাল দেশে।

গোবিন্দগঞ্জের গোলাপবাগ হাট। সারের ডিলারদের গদি ফাঁকা। কেউ নেই। একজন কর্মচারী বললো, 'সবায় গেইছে মহিমাগঞ্জত, রেল ষ্টেশনত। অটে বলে সার পাওয়া যাওয়ার কথা।'

আরো অনেক কৃষক, কামলা, সবাই মহিমাগঞ্জের দিকে যাচ্ছে দলবেঁধে। গোলাপবাগ থেকে মহিমাগঞ্জ ৬ মাইল পথ। হামেদালি হাঁটা ধরলো অন্যসব কৃষকের সাথে। সবার পকেটে টাকা, সবাই সার পেতে চায় ন্যায্যদামে। একজন বললো, 'ন্যায্য অন্যায্য দাম ধুয়া পানি খামো, সার না পালে ফসল মারা পড়বি, ফসল না পালে সারা বছর খামো কী?'

পথে যেতে যেতে নানা কথা শোনা গেলো। রংপুরে ধানের শিষ ভোট পায় নাই বলে সার সব বগুড়া আর দিনাজপুর যাচ্ছে। রংপুরে সার নাকি সরকার দেবে না।

সার নাকি এক মন্ত্রীর দুই ভাস্তে কারখানার গেটে সব কিনে নিয়েছে। তারা এখন সার ছাড়বে না। আস্তে আস্তে ছেড়ে কোটি কোটি টাকা কামাবে।

আরে বোকা, আরেকজনের ভাষ্য, সরকার সার বোকার মতো রফতানি করেছে, সেজন্যই এই সংকট।

ব্যবসায়ী-ব্যাপারিরা মুনাফার জন্য এসব করছে– একথাও বলা হলো।

হামেদালিরা মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের সামনে পৌছালো। সেখানে আরো শত শত মানুষ।

খবর পাওয়া গেলো স্টেশন দিয়ে সারভরা ওয়াগন যাবে বেলা তিনটায়। সবাই ছুটলো স্টেশনের দিকে। তাদের স্টেশনের ওপর দিয়ে সার যাবে বাইরে, অন্য জায়গায়, তা হবে না।

রাত গভীর হয়ে আসছে। ছেলে দুটোকে ভাত খাইয়ে শুয়ে দিয়েছে হামেদালির বউ। ছেলের বাপে গেছে গঞ্জে, এখনও যে ফেরে না। বড় ছেলে ঘুমানোর আগে বলেছে, মাও, বাপে কোলে মিঠাই ধরি আসবে, মোক কোলে ডাকি তুলিবেন।

রাত যখন দ্বিপ্রহর, হামেদালির বউ কাঁদতে লাগলো। ল্যাম্প হাতে গেলো পাশের বাড়ি, ও বিপুলের বাপ, হায় হায় মোর কী সর্বনাশ হইল , সোনা-মোনার বাপে যে আইলে না।

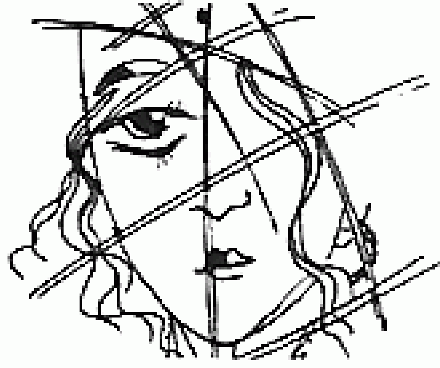
বিপুলের বাপ চোখ রগড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, আইতের বেল আর কান্নাকাটি কর‍্যা কী লাভ, কাইল বিহানে খবর করমো।

সারারাত বিনবিন করে কাদঁলো হামেদালির বউটা।

তার স্বামী হামেদালি তখন শুয়ে আছে গোবিন্দগঞ্জ থানায়, গুলিবিদ্ধ, মৃত, অসনাক্ত। রেলস্টেশনের ওয়াগন থেকে সার লুটে নিতে যায় শত সহস্র কৃষক, গুলি চালায় পুলিশ, নিহত হয় তিনজন আহত হয় বহু – তারা সবাই কৃষক, কামলা।

সারা গোবিন্দগঞ্জ স্তব্ধ হয়ে গেলো, পরদিন , সেই খবর পেয়ে।

হামেদালির বউটা কেঁদেই চলে, তার কান্না আর শুকোয় না।



মোটর সাইকেল ছুটে চলেছে, শব্দ কম, গতি বেশি, ইয়ামাহা ১০০। লাল কালো রঙের বাইকটাকে মনে হয় এক আশ্চর্য লাল ঝুঁটি মোরগ।

শুভ্রর মাথায় হেলমেট, তার মনোযোগ ড্রাইভিংয়ের দিকে।

তার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে খুকু। আরেক হাতে ধরে আছে সাইকেলের সিট। সে বসেছে দু'পা একদিকে ঝুলিয়ে।

শুভ্র বলেছে, 'ছেলেরা বসে বাইকের দুদিকে দু'পা দিয়ে, তুমি যদি নারীবাদী হতে চাও, এই হলো সহজ সুযোগ। ছেলেদের মতো করে বসো।'

খুকু বলেছে, 'আমি নারীবাদী নই।'

আজ শুভ্র খুকুকে নিয়ে চলেছে একটা জায়গায়। কোন জায়গায়. শুভ্র এখনো বলেনি। 'আগে চলো।'

গত সপ্তাহ থেকে ঠিক করা আছে আজকের প্রোগ্রাম। শুক্রবার দুজনে মিলে বেড়াতে যাবে।

খুকু তার ওড়নাটা গলায় পেঁচিয়ে ছোট করে রেখেছে। মোটর বাইক খুব নিরাপদ যান নয়।

সায়দাবাদ– যাত্রাবাড়ি পেরিয়ে তারা ছুটে চলেছে। এটা মহাসড়ক। দূর পাল্লার বাস চলে এ পথে। খুবই বিপজ্জনক পথ।

কিন্তু তারা ছুটে চলেছে সব কিছুর ওপর দিয়ে, সায়েদাবাদের যানজট, যাত্রাবাড়ির ময়লার স্তূপ, বড়ো বড়ো দৈত্যের মতো বাস, নদী, নদীর ওপরে নির্মিত ব্রিজ, ব্রিজের প্রান্তে ট্যাক্স তোলার কাউন্টার – সব কিছুর ওপর দিয়ে তারা চলেছে উড়ে উড়ে, মেঘের গা ঘেঁসে ঘেঁসে, নীল পরিষ্কার আকাশের গায় ভর দিয়ে।

হাইওয়ে ছেড়ে বাইক নামলো ছোটো রাস্তায়।

কিছু দূর চলার পর থামলো বাইক, নেমে পড়লো খুকু। হাতে ব্যথা হয়ে গেছে। চুলগুলো সব উড়ছিলো তার, পেছনে টেনে বাঁধা সত্ত্বেও দুটো চূর্ণ অলক মুখের উপরে। চোখে সান গ্লাস। মুখ শুকনো, ঠোঁট শুকনো।

হেলমেটটা খুললো শুভ্র।

সামনে তাকালো খুকু, হাতে নিলো সানগ্লাসটা। ও মা। এরপর সে বাকহারা। তার সামনে জয়নুলের সেই গরুরগাড়ির চাকা ঠেলার ছবিটির বিরাট ভাস্কর্য। অভিভূত সে। মন্ত্রীভূত।

সো-না-র-গাঁ।

'থ্যাংক ইউ শুভ্র ভাইয়া, থ্যাংক ইউ।'

শুভ্র বললো, 'খুকু, তুমি খুশি হয়েছো?'

'হুঁ, খু-উ-ব।'

মোটর সাইকেলটা একটা সুবিধামতো জায়গায় দাঁড় করানো গেলো। হেলমেটটা ধরা রইলো হাতে।

'চলো।' লোকশিল্প যাদুঘর সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বললো শুভ্র, 'ওর ভেতরে কী আছে দেখে আসি।'

এ-রুম, ও-রুম, নির্জন। নানা মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, নানা ছোটখাটো হাতিয়ার আর ভাস্কর্য।

খুকু হাত ধরলো শুভ্রর।

একটা জায়গা অপূর্ব। নিটোল পুকুর। শানবাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপরে গাছ-গাছালি। নীল আকাশ ছায়া ফেলেছে পানিতে। তার মধ্যে শাদা শাদা মেঘ। ভেলা।

দুজন বসলো ঘাটটায়। তাদের ছায়া পড়লো পানিতে, কেউ দেখলো না।

গল্প চললো। কতো গল্প। এ এক বিস্ময়ই বটে, দুজন নারীপুরুষ এ- রকম নির্জনে পাশাপাশি বসে কী এমন কথা বলে যে, কেটে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা!

কী বিষয় তাদের? মোহামেডান-আবাহনী, সুনীল গাভাস্কার-ইমরান খান, এরিখ ক্ল্যাপটন এ সপ্তাহের নাটক, আসাদুজ্জামান নুর, হরলিক্স কেন খাই, জিটিভির আন্তাক্ষরি, তপন-নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, তারপর সুমন চট্টোপাধ্যায়।

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষপর্যন্ত তোমাকে চাই।

শুভ্র বললো, 'যাক, এ-গানের তবু শেষ আছে, আমি ভাবলাম সমান্তর ধারা, ইনফিনিটি সিরিজ, ...।

যাক, তাহলে গান থেকে তারা এলো বীজগণিতে।

সুমনের চাওয়ার এলতম পদ আছে, কিন্তু এই গল্পের সিরিজ অসীম পর্যন্তই যেতো, বাধ সাধলো এক চমৎকার টোকাই।

বললো, 'স্যার, আপনাগো গাইড লাগবো না?'

'গাইড লাগবে কেন?' শুভ্র বললো।

'এ জায়গায় কতো কী আছে। ঘুরায়া দেখাইতে হইবো না?'

'অনেক কিছু আছে নাকি?' খুকুর চোখে কৌতূহল।

'হ। পানাম নগরে গেছেন?'

' না তো, বললো শুভ্র।

'আসল জায়গাতো স্যার ওইটা, লইয়া যামুনে। কিছু খাইবেন না স্যার। ক্যাফে আছে স্যার।'

'চলো উঠি। এমন প্রশিক্ষিত গাইড পেয়ে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।' শুভ্র বললো। দুজনে উঠলো। টোকাইটির পেছনে পেছনে তারা চললো ক্যাফের দিকে।

টোকাই-গাইড বললো, 'ওই যে স্যার দেখতাছেন, কয়দিন আগে ওইখানে মেলা বসছিলো। চাকমা মাইয়ারা বইসা বইসা তাঁতের কাপড় বানাইছে।'

'তাই নাকি? তুমি কি স্কুলে পড়ো?'

'হ স্যার। ক্লাশ থ্রিতে, আইজকা শুক্রবার। স্কুলবন্ধ।'

'অন্যদিনে গাইডগিরি করো না।'

'করি। স্কুল তো দুই ঘন্টা।'

'গাইড হলে কতো পাও?'

'যার যা ইচ্ছা দেয়। ডলার পাই, পাউন্ড পাই।'

'বলো কী তুমি। ডলার পাউন্ড। তুমি ইংরাজি জানো।'

'সাম সাম।'

তারা হেসে উঠলো গাইডের কথা শুনে।

' তোমার নাম কী ?' খুকু জিজ্ঞেস করলো।

'রহিম ।'

'খুব সুন্দর নাম। রহিম বাদশা', বললো শুভ্র।

ক্যাফেতে তেমন কিছু নেই। চিপস আছে। কোল্ডড্রিংকস আছে। আর আছে আইসক্রিম।

দু'টো চকবার কিনে ওরা বসে বসে খেতে লাগলো।

রহিম কিছুই খাবেনা। কিছুতেই রাজি করানো গেলোনা তাকে।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। বাইকটার কাছে ফিরে এলো তারা। রহিমকে বললো, 'তোমাকে তো সঙ্গে নিতে পারছি না। তুমি বলে দাও কোন পথে পানাম নগর। আর তোমার গাইডের ফি কতো দিতে হবে?'

'খুশি হয়া যা দ্যান।' সে কিছুতেই এর বেশি কিছু বলবে না। বিশ টাকার একটা নোট তাকে দিলো শুভ্র। সে খুব খুশি।

রহিমের দেখানো পথ ধরে ওরা চললো পানাম নগরের দিকে। রাস্তা বেশি প্রশস্ত নয়। ইট বিছানো এবরো-থেবরো পথ। একটা ব্রিজ পড়লো, সম্পূর্ণ ইট দিয়ে বানানো রিংয়ের। শুভ্র বললো, 'এটাকে বলা হয় আর্চ। বাংলায় খিলান। এভাবে ইট সাজালে সিমেন্ট লোহা কিছু লাগবে না, তুমি ব্রিজ বানাতে পারবে। আগের কালের বিল্ডিঙের বারান্দাগুলো , জানালাগুলো এজন্যই গোল গোল আর্চের তৈরি।' চলন্ত বাইকে খুকু সেই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে পেলো কি পেলো না!

পানাম নগর। রাস্তার দুই দিকে একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি। ইট-সুরকির। পুরানো পুরানো সব বাড়ি। জানালার দরজার চৌকাঠ কবাট কোনোটার আছে, কোনোটার নেই। পুরানো স্থাপত্যরীতির বাড়ি বলেই বেশ সৌকর্যময়। কিন্তু আশ্চর্য হলো—এই নগরে কেউ থাকেনা। একটা বিরাট জনপদ তার ভবনগুলো ধরে রেখেছে, কিন্তু তার মানুষগুলো কোথায় গেলো ? দু একটা ছিন্নমূল পরিবার আশ্রয় নিয়েছে একটা দুটো ঘরে, এক-আধটা ক্লাবের সাইনবোর্ডও আছে। আর সব ফাঁকা। নির্জনতা শুধু , শূন্যতা শুধু। এই ভবনগুলো একদিন গম গম করতো মানুষের পদচারণায়, কেজো লোকের দরাদারিতে, রসিকের রসিকতায়, ব্যাপারির নিক্তিতে, গায়কের গানে, শিশুর কান্নায়, নারীর কাঁকনের নিক্কনে। আমাদের মতোই মানুষ ছিল তারা। তাদেরও এমনি ছিলো হাত-পা-চোখ, আর ছিলো হৃদয়, আর ছিলো ভালোবাসা। আর অশ্রু কান্না হাসি। তারা আজ কোথায়? তারা নেই কেন? সবাই কি মারা গেছে? সবাই কি মারা যাবে? সবাইকে কেন মরতে হয়? এদের উত্তরপুরুষেরা কোথায়?

বিকেল হয়ে এসেছে। ছায়া হয়ে পড়েছে লম্বিত। শীত শেষে এক অদ্ভুত গন্ধ বেরোয়, নতুন চড়া রোদের গন্ধ।

শুভ্র অবাক হয়ে হাঁটছে একা একা।

খুকু পিছিয়ে পড়েছে।

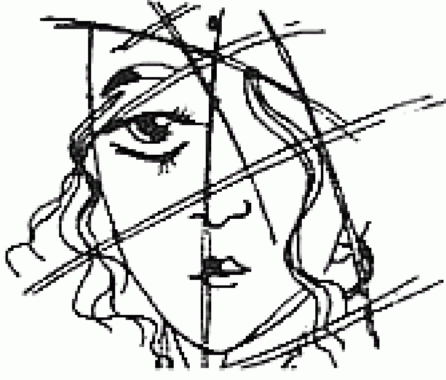
সহসা খুকুর খুব ভয় লাগলো, খুব। সে দৌড়ে গেলো শুভ্রর কাছে, জড়িয়ে ধরলো তাকে, 'এ তুমি আমাকে কোথায় এনেছো? আমার ভয় করছে।'

শুভ্র খুকুর মুখটা ধরলো দুই হাতে, তারপর নিজের মুখ নামিয়ে আনলো। গভীর আবেগপূর্ণ এক দীর্ঘ চুমু, চার ঠোঁটে, রচিত হলো।

খুকু গলে গেলো, মোম।

কোকিল ডেকে উঠলো গাছে। বসন্ত এসে গেছে। মরার কোকিল, তুমি এই সময়ে ডাকিয়া উঠিলে কেন? মধ্যবিত্তের ভালোবাসার গল্প কেবল জমে উঠেছে, এই সময়ে কোকিল ডাকলে চলবে কেন? এ তো বঙ্কিমী ধাঁচের গল্প নয়, এ যে আমাদের বাজার-চলতি ভালোবাসার আবেগবিহ্বল কথামালা।

যাক, কোকিল যখন ডেকেই উঠেছে, তখন আমের গাছে মুকুলের গন্ধও ছুটুক। দক্ষিণা বাতাসও বয়ে যাক মৃদুমন্দ। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। এবার দুজনে ফিরুক ঢাকার দিকে।



দেশের বাড়ি থেকে এসেছে চিঠি, হামেদালির স্ত্রী লিখিয়ে নিয়েছেন আরেক জনের হাতে।

চিঠি পড়ে আবিদুর রশিদ স্তম্ভিত, হামেদালি মারা গেছে! পুলিশের গুলিতে! সার আনতে গিয়ে!

একটা লোক এভাবে মারা গেলো!

এখন কী হবে তার বিধবা বউয়ের, দুটো অবোধ শিশু সোনা-মোনার!

কী হবে তার ঘর-দোরের, কে আবাদ করবে গোরস্তানের পাশের তিনবিঘা জমি। ওই জমি আবিদুর রশিদ দিতে চেয়েছিলেন তাকে, দেয়া হলো না!

মনে পড়লো তার শেষ কান্না, শেষ আর্তি, আর কি দেখা সাক্ষাৎ হবি?

আবিদুর রশিদ খুব মুষড়ে পড়লেন। চিন্তিত এবং উত্তেজিতও। সার নিয়ে দেশে একি হচ্ছে। মিল গেটে যে সার ১৮০ টাকা, যার দাম প্রান্তিক পর্যায়ে কিছুতেই ২৫০ টাকার বেশি হতে পারে না, তা কেন ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৮০০ টাকায় বিক্রি হতে

হতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো? কেন মরতে হলো হামেদালিকে, সঙ্গে আরো দুজনকে? কাগজে পড়েছেন গাইবান্ধায়ও গুলি চলেছে, সেখানেও মারা গেছে মানুষ! আরো অনেক জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। পত্রিকাঅলারা লেখেন – কৃষকবিদ্রোহ। এ অবস্থা হতে পারলো কী করে?

এই দুর্যোগ মনুষ্যসৃষ্ট। সারের দাম বাড়লে ক্ষতি হবে কৃষকের, ফসলের, দেশের। কিন্তু মুনাফা অর্জন করেছে কেউ কেউ। তারা কে, তারা ব্যবসায়ী না রাজনীতিবিদ না টাউট, তারা কোন দলের, তারা মন্ত্রী নাকি মন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, এ প্রশ্ন বড়ো নয়। মুনাফার জন্যে মানুষ কি মানুষকে মারতে পারে? এই যে ১৮টি কৃষকের মৃত্যু, আর ফসলের ক্ষতির মুখে জিম্মি গোটা দেশ – এর বিনিময়ে কয়েকজন লোক নিজের পকেট ভারি করার প্রয়াস পেলো কী করে? মানুষ কি আর মানুষ নেই? মনুষ্যত্ব বলে কি আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই?

আবিদুর রশিদ তার গোবিন্দগঞ্জে থাকা ভাস্তে আব্দুর রবকে চিঠি লিখতে বসলেন। কল্যাণীয়েষু, আমার পাওনা বাকি বিশ হাজার টাকা তুমি হামেদালির বিধবা স্ত্রীকে দিও। সরাসরি টাকা দিতে অসুবিধা থাকলে কোনো কিছু কিনে দিও, যাতে পরিবারটা জলে ভেসে না যায়।

হামেদালির মৃত্যুর আগে আমি গোরস্তানের পাশের তিন বিঘা তাকে দিতে চেয়েছিলাম। এখন তার দুই ছেলের নামে দিতে চাই। নাবালকের নামে জমি রেজিস্ট্রি করা যায় কিনা, আমি জানি না। তুমি যদি বাবা দয়া করে জানাও, খুব খুশি হবো।

বাবু বারান্দায় গিয়ে দেখলো, সর্বনাশ, মিঠু পড়ে আছে উল্টে, খাঁচার নিচে। সন্ত্রস্ত হয়ে সে এলো খুকুর কাছে।

'আপা, এদিকে এসো?'

' কেন, কী হয়েছে।' বাবুর মুখের ভঙ্গি দেখে তাড়াতাড়ি চললো খুকু। বারান্দায় গিয়ে দেখলো – মিঠু মারা গেছে।

দুজনে খুব মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায়। যেন এই পাখিটার মৃত্যুর জন্যে তারাই দায়ী। তারা দুজনেই নির্বাক।

আবিদুর রশিদ এলেন বারান্দায়। মৃত পাখির খাঁচার কাছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ছেলে–মেয়ে, তিনি দেখলেন।

তাঁর চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো টুপ টুপ করে। বাবাকে কাঁদতে দেখে হাউমাউ করে কেদেঁ উঠলো খুকু–বাবু।

আবিদুর রশিদের মনের মধ্যে তখন উচ্চারিত হচ্ছে –

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে

বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।

মৃত পাখিটাকে কী করা হবে? বুয়া বললো, 'কী আর করবেন? ডাস্টবিনে ফেলায়া দেওয়া ছাড়া তো উপায় নাই। আজিমপুর গোরস্তানে পাখির কবর দেয়ার নিয়ম নাই।'

শুভ্র এলো বিকেলে, দুঃখ পেলো সেও, বললো, 'বিদেশে পোষা প্রাণীদের আলাদা সমাধিক্ষেত্র থাকে। এদেশে মানুষেরই কবর হয় না।'

শেষ পর্যন্ত বুয়াকে নির্দেশ দেয়া হলো বাইরে কোথাও মাটিতে পাখিটাকে পুঁতে দেবার। বাবু তার টবে ফোটা একটা গোলাপ ফুল দিলো বুয়ার হাতে। পাখিটার সঙ্গে এই ফুলটাও পুঁতে দেবে।

আবিদুর রশিদ কিন্তু এই সময়টায় থাকলেন না বাসায়। তিনি ঢুকে পড়লেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হাঁটতে লাগলেন আপন মনে। যেন তিনি স্বাস্থ্যসন্ধানী, ডাক্তারের পরামর্শে হাঁটছেন।

বুয়া চললো টিয়াপাখির শব নিয়ে, নিচতলায় বাসা, কিন্তু এখানে এক টুকরো মাটি নেই, চললো সে আরো সামনে, তার হাতে একটা খুড়পি, এ খুড়পিটা কাজে লাগে টবের মাটি কোপাতে। কোথাও মাটি পেলো না, আরেকটু সামনে গেলো, একেবারে বড়ো রাস্তায় চলে যেতে হয় তাকে; কিন্তু এই কাজটি সে কোনো দিন করে নাই। উপায়ান্তর না দেখে বুয়া মিঠুকে ফেলে দিলো ডাস্টবিনে। গোলাপ ফুল ডাস্টবিনে ফেলা উচিত হবে কি হবে না, কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে পুষ্পবৃষ্টি করলো।

ফেরার সময় তার মন খারাপ হয়ে এলো। কাজটা সে ঠিক করেনি। পাখিটাকে বাসার লোকজন খুব ভালোবাসে। সে কি বাসায় গিয়ে মিথ্যে বলবে?

বুয়া উল্টোমুখে হাঁটতে লাগলো। ডাস্টবিনের নোংরায় পা রেখে অনেক কষ্টে সে পুনর্বার তুললো পাখিটাকে।

চললো বড়ো রাস্তার দিকে। বড়ো রাস্তায় টিএন্ডটি টেলিফোনের তার বসানোর জন্যে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। সেই গর্তের মধ্যে বুয়া ফেলে দিলো পাখিটাকে। খানিক মাটি তুলে চাপা দিলো গভীর মমতায়।

ফেরার সময় তার খুব কান্না পেলো। তার স্বামী মারা গেছে বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে। একটা মেয়ে আছে, বারো বছর বয়স। সেই মেয়েটা কাজ করে রংপুরে এক সাহেবের বাসায়।

বুয়া খুব চেষ্টা করলো নিজের স্বামীর মুখ মনে করার। তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। কতো জনের মুখ চেষ্টা ছাড়াই মনে আসে, অথচ স্বামীর মুখ সে কেন মনে করতে পারে না?

খুকু বললো, 'বাবু আয়, তোর পড়াশুনার অগ্রগতি দেখি? বই নিয়ে আয়।'

বাবু বললো, 'আমার পড়াশুনা ভালো লাগে না আপা।'

'বলিস কি তুই? বড়ো হয়ে কী করবি?'

'আমি ঠিক করেছি আমি ট্রাফিক পুলিশ হবো। কতো সুন্দর হাত উঁচু করলেই সব গাড়ি থেমে যায়।'

'গুড। তুই জানিস, ঢাকা শহরে পাগলদের সব চেয়ে প্রিয় কাজ কী?'

'না, আপা।'

'ঢাকা শহরে যারা পাগল হয় তারা প্রথমেই যে কাজটি করে তা হলো ট্রাফিক কন্ট্রোলিং। এই পাগলদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ন্যাংটো পাগল।'

'আপা,' ট্রাফিক পুলিশেরা কি পাগল?'

'তা বলিনি', বলেছি পাগলেরা ট্রাফিক পুলিশ হতে চায়। তবে ঢাকায় যে হারে যানজট বেড়ে গেছে, ট্রাফিক পুলিশেরা হয় পাগল হয়ে গেছে, নয়তো অচিরেই হবে।'

'আপা, তোমাকে এবার একটা কোশ্চেন করি?'

'কর।'

'তুমি তো বুয়েটে ভর্তি হয়েছো। কম্পিউটারে। আচ্ছা, তুমি বলো, টেলিভিশন আর কম্পিউটারের পার্থক্য কী।'

'না, পারলাম না।'

'কম্পিউটার হলো ইন্টেলিজেন্ট বক্স আর টেলিভিশন হলো ইডিয়েট বক্স।'

বাব্বা। তোর মাথায় এতো বুদ্ধি।'

'খুব বুদ্ধি আপা। আপা টিভি দেখে দেখে আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে। শুনবে কী বুদ্ধি?'

'বল।'

'আপা। আমার মনে হয় আমি বা তুমি এই বাড়ির ছেলেমেয়ে নই। আমাদের কাউকে মনে হয় বাবামা কুড়িয়ে পেয়েছেন।'

'বলিস কী তুই?'

'হ্যাঁ আপা। টিভি নাটকের মতো। আমার মনে হয় আমাকেই কুড়িয়ে পেয়েছেন। আমি তো ছেলে। ছেলের শখ তো বেশি থাকে।'

'শোন। কাল থেকে তোর টিভি দেখা বন্ধ। বল, ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গিয়াছিলো– ইংরাজি বল।'

'বলবো আপা। তার আগে আরেকটা কথা শোনো। তুমি আমি দু'জনেই যদি বাবা-মার নিজের পেটের হয়ে থাকি, তাহলে আরেকটা ঘটনা ঘটবে। বলবো?'

'বল। কী ঘটনা?'

'দেখা যাবে আমাদের আরেকটা ভাই বা বোন আছে। গ্রামে থাকে। একদিন হঠাৎ করে এসে হাজির হবে।'

'এটাও কি টিভি নাটক দেখে শেখা?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ইংরাজিটা বল।ট্রান্সলেট ইনটু ইংলিশ'

'বলছি। সোজা। দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইয়েড বিফোর দি ডক্টর কেম।'

'বল, দশমিক এককে দশমিক এক দিয়ে গুণ করলে কতো হয়?'

'দশমিক শুন্য এক।'

'গুড। তুই খুব ইন্টেলিজেন্ট। শোন্। আমরা খুব গরিব। খুব না, তবে আমাদের বাবা তো সৎ মানুষ। তার তেমন ধনসম্পদ নেই। দেখিস না আমাদের বাসায় ফ্রিজ নেই। টেলিভিশনটা সাদাকালো। আমাদের সম্পদ কী তাহলে জানিস? আমাদের সম্পদ হলো বুদ্ধি। আমাদেরকে বড়ো হতে হবে পড়াশুনা দিয়ে। তুই যা বললি, অন্য কেউ শুনলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়বে। তবে আমি মোটেও চিন্তিত নই। বুদ্ধিমানেরা এ রকম উদ্ভটভাবে ভাবতে পারে। তবে চারদিকের সবাই ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারে। বেশি জ্ঞানের কথা সবাইকে বলতে নেই। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'আর আমাদের একটা কাজ হলো খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করা। যখন পড়বি, তখন খুব মন দিয়ে পড়বি। সারাক্ষণ পড়তে হবে, তা অবশ্য নয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এখন বল। তুই কী চাস? আমার কাছে এখন কিছু একটা চা, আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে সেটা তোকে অবশ্যই দেবো।'

'কিছু দিতে হবে না আপা। তুমি যে কতো ভালো। আমরা হলাম সুখী পরিবার। বাবা-মা-ভাইবোন আর দাদি।'

'ঠিক আছে। চল এক কাজ করি। পিকনিক। একদিন বাবাকে রেহাই দিবো বাজার করা থেকে, তুই করবি বাজার। চিন্তা করিস না, আমি সঙ্গে যাবো। মাকে মুক্তি দিবো রান্নাঘর থেকে। রান্না করবো আমি নিজে। তারপর সবাই মিলে খাবো। ছাদে বসে খাবো।'

'খুব ভালো হবে আপা। তোমার মাথায় যে বুদ্ধি গিজগিজ করে না। কিন্তু আপা, শুভ্র ভাইয়া কী করবেন?'

'তাতো ঠিক। শুভ্র কী করবে? ঠিক আছে সেটাই ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে। জোরজুলুম তো করা যাবে না। স্বেচ্ছাশ্রম।'

বাবু আর খুকু গেলো বাজারে। হাতিরপুল বাজার হাতের কাছেই। কাজেই অসুবিধা তেমন কিছু হলো না। খুকু ঠিক করেছে সে রাঁধবে চাইনিজ। কর্ন ফ্লাওয়ার, বেসন, সিরকা, চিংড়ি, মুরগি সব তারা কিনলো ফর্দ অনুযায়ী। বাজার করতে গিয়েই বুঝতে পারলো – দুনিয়াদারি অতো সোজা নয়। সকাল থেকে শুরু হলো খুকুর পরিশ্রম। বুয়ার অবশ্য ছুটি মিললো না। তাকে রোজকার মতোই গায়ে খাটতে হলো সকালসন্ধ্যা। সন্ধ্যার মধ্যেই খাবার তৈরি হয়ে গেলো। খুকু রেঁধেছে চিকেন কর্ন স্যুপ, ফ্রাইয়েড চিকেন, প্রন ভেজিটেবল্‌স, আর ফ্রাইয়েড রাইস। পাশে সহজ রান্না শিক্ষা বই। পড়ে আর বিড় বিড় করে। লবণ পরিমাণ মতো। আরে বাবা পরিমাণ মতো মানে কী? মা, একটু দেখো তো এই পরিমাণ লবণ ঠিক আছে?

শুভ্র বলেছে, সে একটা সারপ্রাইজ নিয়ে আসবে। খুকু আর বাবু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই সারপ্রাইজের জন্যে।

ছাদের ওপরে খাবার প্লানটা অবশ্য বাদ দেয়া হলো। তার বদলে বিছানো হলো শীতল পাটি। খাবার পর সবাই যাবে ছাদে, ওখানে হবে ভ্যারাইটি শো। কাগজের চিরকুট টেনে সবাইকে পারফরমেন্স শো করতে হবে।

সব কিছু প্রস্তুত, কেবল অপেক্ষা শুভ্রের জন্যে, আর উনি আসছেন না। সম্রাট তো। দেরি করে আসতে হবে। বাবা-মার সামনে প্রেস্টিজটা পাংচার করতে চায় আমার – রেঁধে বেড়ে বাথরুমে গিয়ে গায়ে ঝপাঝপ পানি ঢালতে ঢালতে ভাবলো খুকু।

শুভ্র এলো রাত ন'টায়। কলিং বেল শুনে খুকুর প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটা লোক এতোটা হেনস্থা করতে পারে।

দরজা খুলে খুকু অবাক। শুভ্রর সঙ্গে একটা মিষ্টির বাকসো আর একজন অতিথি, সেই অতিথির দিকে তাকিয়ে খুশিতে বিস্ময়ে সে কী যে করবে। জুয়েল আইচ। শুভ্রর নাকি বড়ো ভাইয়ের বন্ধু তিনি। সেই সুবাদে ঘরে নিয়ে এসেছে সে এই বিখ্যাত প্রিয় দর্শন মানুষটাকে।

জুয়েল আইচকে বাইরের ঘরে বসিয়ে খুকু শুভ্রকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি কী কান্ড করেছো? জুয়েল আইচ আসবেন, আগে বলবে না। আমি নিজে রেঁধেছি। কেউ খেয়ে দেখেনি। এ সব খাবার কেউ মুখে দিতে পারবে? এদিকে স্যুপ রেঁধেছি কিন্তু বাসায় স্যুপের কোনো বাটি নেই। ভেবেছিলাম সবাইকে চায়ের কাপে দেবো, তুমি যে কী করো না।'

শুভ্র গালে টোল ফেলে হাসলো, বললো, 'পাকা গিন্নির মতো কথা বলছো। এখনই তোমার কতো যন্ত্রণা। আমাদের সংসার হলে আরো কতো ভোগান্তিই না তোমার হবে।'

জুয়েল আইচ কিন্তু সবাইকে আপন করে নিলেন। খাবার টেবিলে তিনি মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন। বাবা-মা-দাদি সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। বাবু শুভ্রর কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, 'ওনাকে আমি কী বলে ডাকবো?'

'কেন, ভাই।'

'যাহ্। বিখ্যাত মানুষ বুঝি কারো ভাই হয়? আমি যদি ডাকি জুয়েল আইচ ভাই, কেমন শোনাবে?'

জুয়েল আইচ খুবই প্রশংসা করলেন রান্নার। বললেন, 'রান্না কিন্তু ম্যাজিক। একই পরিমাণ উপকরণ একই সময় ধরে রান্না করেও কারোটা খেতে হয় অপূর্ব, কারোটা হয় বিস্বাদ। এটা হলো যাদু। হাতের যাদু। সবার থাকে না। খুকুর আছে।'

খুকু লজ্জায় লাল হয়ে গেলো।

খাবার পর ছাদে আর যাওয়া হলো না। জুয়েল আইচকে ছাদে খাবার কথা লজ্জায় ওরা বলতেই পারলো না।

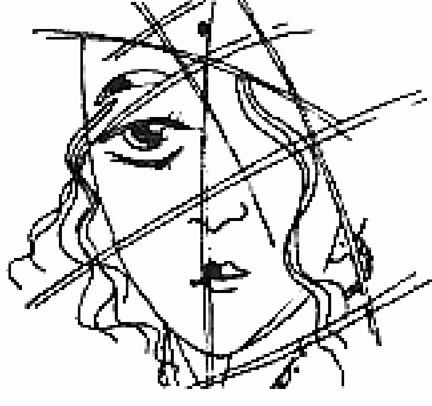
বাবু বললো, 'আমি বড়ো হয়ে ম্যাজিশিয়ান হতে চাই। আপনি কি আমাকে ম্যাজিক শেখাবেন?'

জুয়েল বললেন, 'হ্যাঁ, শেখাবো।'

বাবু বললো, 'শেখান তো?'

জুয়েল বললেন, 'যাদু করতে হলে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। এ জন্যে তোমাকে করতে হবে দুটো কাজ। এক. তোমাকে বড়ো হতে হবে। দুই. তোমাকে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে।'

জুয়েল আইচ সঙ্গে এনেছেন তাঁর বাঁশি। তিনি বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। কি যে যাদুকরী সেই সুর! সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো। জুয়েল আর শুভ্র বিদায় নিলেন অনেক রাতে। তারা চলে যাবার পরও বাতাসে যেন সেই বাঁশি বেজেই চললো, করুণ, হৃদয়দ্রাবী, মর্মস্পর্শী সুরে।



কম্পিউটারে বসে গাড়িচালানোর খেলাটা এখন সবচেয়ে প্রিয় কাজে পরিণত হয়েছে বাবুর। এখন পারলে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা সে এই গাড়ি চালিয়ে কাটায়। আজ সকাল থেকে সে ছটফট করছে এই খেলাটা খেলার জন্য। স্কুল আজ ছুটি।

কম্পিউটারটা অন করা দরকার কিন্তু আপা ঘুম থেকে জাগছে না। কিছুক্ষণ এটা ওটা করে বাবু এলো খুকুর বিছানার পাশে। কম্পিউটার যেভাবে শব্দ করে, তেমনি ভঙ্গিতে সে বললো, 'গুডমর্নিং খুকু মনি। নটা বাজে। চা ঠান্ডা। ঘুম থেকে উঠে পড়ো।'

খুকু জেগেই ছিলো, কিন্তু তার শরীর খুব খারাপ লাগছে। বললো, 'বাবু, খুব খারাপ লাগছে রে।'

বাবু বললো, 'ও বাব্বা, কম্পিউটারেরও কি অসুখ-বিসুখ হয় নাকি?'

হাসনা বেগম এলেন রান্না ঘর থেকে। বললেন, 'কী রে মা, এতো বেলায় বিছানায়। খুকু বললো, মা তোমাকে একটি কথা বহুদিন থেকে বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠে না। কদিন হলো পেটে খুব ব্যথা হয়। আজ ভোরে বমিও করেছি।'

হাসনা বেগম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ধরনের ব্যথা?'

'চিন চিন করে।'

'আয় ওঠ্। নাশতা কর। পেট খালি থাকলে এ রকম হয়।'

'পেট খালি না থাকলেও হয় মা।'

'ওঠ তো ওঠ।'

খুকু কষ্ট করে উঠলো। দাঁত মেজে এসে আবার বসলো বিছানায়। হাসনা বেগম নাশতা নিয়ে এলেন বিছানায়। 'হা কর, খাইয়ে দেই।' খুকু ব্যথাক্লিষ্ট মুখে হা করলো। বাবুও আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল, এক-আধ লোকমা, সে জানে, তার গালেও জুটবে। আর কায়দা করে কম্পিউটারটা অন করার প্রস্তাবটাও সে দিয়ে ফেলবে।

সারাটা দিন ভালোই গেলো খুকুর। রাতে ঘুমুতে গেলো তাড়াতাড়ি। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলো পেটের ব্যথায়। অসহ্য ব্যথা। ব্যথায় তার চোখ বেয়ে নেমে এলো জল, সে ডাকতে লাগলো 'মা' 'মা' করে। ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠলো বাবু, ঘর অন্ধকার, সে ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'কী হয়েছে আপা।'

দাদিও উঠলেন ঘুম থেকে, জ্বালালেন বাতি; খুকু তখনো ডেকেই চলেছে, 'মা', মা।'

দাদি বললেন, 'কী হয়েছে খুকু?'

'দাদিআম্মা, পেটে ব্যথা। মাকে ডাকো।'

হাসনা বেগম এসে বসলেন। পাশে এলেন আবিদুর রশিদ, অনেক রাত, এতো রাতে কোথায় যাবেন, কী করবেন, বুঝতে পারলেন না। বাথরুমে গেলো, বমি করলো খুকু।

তারপর বাথরুম থেকে এসে বললো, 'ব্যথাটা এখন আর নেই। যাও, তোমরা ঘুমুতে যাও।'

বাবু গিয়ে শুলো বাবার খাটে। হাসনা বেগম শুলেন মেয়ের পাশে।

বাইরে ভোর হচ্ছে, ঢাকার সমস্ত মসজিদ থেকে শুরু হলো আজান। দাদি উঠলেন, নামাজ পড়তে। তার এই নাতনিটা বড়ো ভালো, বড়ো লক্ষ্মী। নামাজ শেষে একবার সুরা ফাতিহা, তিনবার সুরা আহাদ, একশ একবার দরুদ শরিফ পড়ে দোয়া করতে বসলেন। হে আল্লাহ, হে রহমানুর রাহিম, আমাদের এই মেয়েটিকে তুমি রহম করো, তুমি কোনো বিমার দিও না।

নামাজ পড়ে দোয়া করে অনেকক্ষণ পরে জায়নামাজ থেকে উঠলেন তিনি। বাইরে সকাল হয়েছে, সূর্য উঠছে। সূর্যের একফালি আলো এসে পড়েছে খুকুর গায়ে। সূর্যের আলো হলো আল্লাহ্‌র নেয়ামত। দাদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মেডিসিনের অধ্যাপক খোদাবক্স মৃধার কাছে খুকুকে নিয়ে গেলেন আবিদুর রশিদ। বিরাট লাইন। বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে হলো বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। ডাক্তার বললেন অনেকগুলো প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করাতে। আপাততঃ দুটো ওষুধ দিলেন। এর মধ্যে একটা ট্যাবলেট খেতে হবে ব্যথা উঠলে। রাতে ফের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লো খুকু। ট্যাবলেট দু'টো খেয়ে আধঘন্টা পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করে রিপোর্ট পেতে পেতে লেগে গেল দু'দিন। কোন টেস্ট কোন ল্যাবরেটরি থেকে করতে হবে, তাও বলে দিয়েছিলেন ডাক্তার।

সব দেখে ডাক্তার বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন, ডাক্তার সোবহানকে একটু দেখান। উনি গাইনোকোলজির স্পেশালিস্ট।'

সে রাতে আর যাওয়া হলো না ডাক্তার সোবহানের কাছে। যেতে হলো পরদিন।

ডাক্তার সোবহান রিপোর্ট দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আরেকটা টেস্ট করান।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'কী বুঝছেন? খারাপ কিছু।'

ডাক্তার বললেন, ' না না। এখনই বলবো কী করে। টেস্টটা করান। তবে কোনো রোগই ছোটো নয়, কোনো রোগই বড়ো নয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী বেঁচে থাকতে পারে বিশত্রিশ বছর, আবার পায়ে আলপিন ফুটে কেউ মরে যেতে পারে দশদিনের মাথায়।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে খুকু বললো, 'বাবা, তুমি বেশি বেশি ঘাবড়াচ্ছো। আমার তেমন কিছু হয়নি। চলো, দুজনে মিলে রিক্সায় ঘুরে বেড়াই।'

ওরা ঘন্টা হিসেবে রিক্শা ভাড়া করলো, প্রতি ঘন্টা ১৮ টাকা। রিকশাঅলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো। বুদ্ধিমতী খুকু বললো, 'উনি আমার বাবা। আমরা যাবো সংসদভবনটা বেড়িয়ে দেখতে। চলুন ওই দিকটায়।'

খুকু বললো, 'বাবা, আমার জন্মের দিনের কথা তোমার মনে আছে?

আবিদুর রশিদ বললেন, 'হ্যাঁ। মনে থাকবে না কেন?'

'তা অবশ্য ঠিক। তোমার যা অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। বিশখন্ড রবীন্দ্ররচনাবলী মুখস্থ।'

'না না, তা ঠিক নয়। চার পাঁচটা কবিতা, আর কিছু কবিতার লাইন – এইতো।'

'বাবা, আমাকে আমার জন্মের দিনের গল্প করো।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'কী বলবো। তোর দাদা মেয়ে দেখে পছন্দ করে রেখেছিলেন। আমাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে গেলেন ঢাকা থেকে। বললেন, মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। ভালো বংশ। বিয়ে কর।'

'জীবনে তোর দাদার মুখের ওপরে কোনো কথা বলার সাহস হয়নি।

করে ফেললাম।'

'মাকে তুমি আগে দেখোনি?'

'না।'

'বরযাত্রী গেলে কিসে?'

'নৌকায় চড়ে। কাটাখালি নদী দিয়ে। তখন আমাদের বাড়ির সামনেও নদী ছিল ভরা। তোর নানা বাড়ির ঘাটে গিয়ে নামলেই চলতো।'

'তারপর?'

'তোর মাকে নিয়ে এলাম ঢাকায়। তখন দিন ছিলো গনগনে। দেশটা ছিলো কবিতায় টালমাটাল। ভেবেছিলাম কিছু না করে শুধু কবিতা লিখে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু অতোটা সাহসী ছিলাম না। সংসারে জড়িয়ে গেলাম। ৭৭ সাল। দেশে সামরিক শাসন। তোর জন্মাবার ডেট কাছে আসতে লাগলো। আমরা তখন থাকতাম পুরানো ঢাকায়, গিরিদাস লেনে। তোর মাকে ভর্তি করলাম ন্যাশনাল হাসপাতালে। তখন হাসপাতাল ছিলো পুরোনো বিল্ডিঙে। সুরকিঅলা দালান। বর্ষাকাল। সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। তোর মাকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। একটু পরে নার্স বাইরে এসে বললো, মেয়ে। দু'জনেই ভালো আছে।'

'তুমি খুশি হয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। খুব। তোকে একটু পর বের করে কেবিনে নিয়ে এলো এক আয়া। আমি তাকে পঞ্চাশ টাকা বখশিস দিলাম। তোর দাদি ছিলেন কেবিনে। বললেন, মেয়ে হয় ভাগ্যবান বাবার।

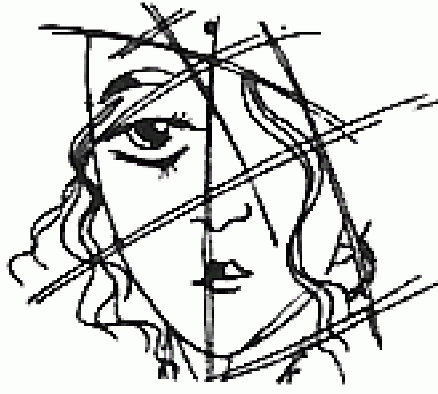
তোকে দেখে আমার কী যে খুশি লাগলো। আমার মেয়ে। আমার মেয়ে। তাকিয়ে দেখলাম এক পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু। চোখকান-হাত-পা-আঙুল সব আছে। আমি খুশিতে কী করবো, বুঝতে পারছিলাম না।

তোর মায়ের কেবিনে আসতে একটু দেরি হচ্ছিলো। হাসনা এলে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ে কী খাবে?'

রিকশা মানিক মিয়া এভিনিউয়ে চলছে। সংসদ ভবনের সিঁড়ির রাস্তায় খুকু বললো, 'বাবা, এখানে একটু নামবে!'

'তোর ইচ্ছে করছে?'

'না, থাক। রিকশায় চড়েই বাসায় যাই। সবাই যদি আবার চিন্তা করে?'



পারাপার স্টোরে গেছেন আবিদুর রশিদ। টাকাপয়সার হিসাবটা ঠিক মতো করা দরকার। কোথাও থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়। মেয়েটার অসুখ, ডাক্তার দেখাতে আর প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করাতে টাকা লাগছে।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে তিনি দোকানের ভেতরে ঢুকলেন। আব্দুল হাই আর গুল্লু মিয়া বুঝে গেলো- আজ সাহেবের টাকার দরকার। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো, মালিককে কোথায় বসাবে। আবিদুর রশিদ বললেন, 'ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এই টুলটাতেই বসছি।' খদ্দেরদের জন্যে রাখা গদিঅলা টুলে বসে পড়লেন তিনি।

একটা রিকশা এসে থামলো দোকানের সামনে। একটা মধ্যবয়সী লোক, চুল উসকো খুসকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ লাল, চেহারায় বিষাদ ও অবসাদের ছাপ, এসে ঢুকলো দোকানে।

'স্লামালেকুম।' আব্দুল হাই সালাম দিলো।

'ভালো দেখে কাপড় দেন। কাফনের।'

'কতোখানি দেবো?'

'এই ধরেন পাঁচ বছরের মেয়ের।'

আবিদুর রশিদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো, বললেন তিনি, 'কিছু যদি মনে না করেন, মরহুমা আপনার কে হয়?'

'ভাস্তী। ভাস্তী মানে মেয়ের মতো। একই বাসায় থাকি।'

'স্যরি। আপনাকে ডিস্টার্ব করছি। কী হয়েছিলো মেয়েটির?' জিজ্ঞেস করলেন আবিদুর রশিদ।

'ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সার।' লোকটি কাপড় নিয়ে দাম দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে উঠলো রিকশায়।

আবিদুর রশিদের জিভ শুকিয়ে এলো। তিনি বললেন, 'আজ উঠি।'

আব্দুল হাই বললো, 'স্যার, এই সিন দেখতে দেখতে আর চোখে লাগে না বুকও কাঁপে না। মৃত্যুটা গা সওয়া হয়ে গেছে আমাদের।'

গুল্লু বললো, 'স্যারের যাওনই ভালা। কাস্টোমার দেইখা খুশি না হয়া মন খারাপ করলে তারে দিয়া ব্যবসা হইতো না। ব্যবসা একটা কঠিন জিনিস।'

আবিদুর রশিদ বেরিয়ে এলেন। এলিফ্যান্ট রোডের ল্যাবরেটরি থেকে খুকুর একটা প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট নিতে হবে। এই রিপোর্ট থেকেই সম্ভবতঃ ধরা যাবে রোগটা কী। হাঁটতে হাঁটতে গেলেন ল্যাবরেটরিতে। রিপোর্ট পাওয়া গেলো। তার মনটা অতিরিক্ত খারাপ। নিজ সন্তানের অসুখবিসুখের চেয়ে কষ্টকর বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। খামবন্দি রিপোর্ট নিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি ঘরে ফিরলেন।

বাসায় গিয়ে তার মনটা ভালো হলো খানিকটা। খুকু আর বাবু কম্পিউটারে বসে খেলছে। দাবা খেলা। আবিদ বললেন, 'আমাকেও শিখিয়ে দে, দেখি আমার সঙ্গে তোরা দু'জনে মিলে জিততে পারিস কিনা।'

বাবু খুব খুশি হয়ে বললো, 'খুব সোজা বাবা, শুধু মাউসটা ঘুঁটির ওপরে ধরে চাপ দিয়ে যে ঘরে নিতে হবে, সেখানে টেনে নিয়ে ছেড়ে দাও।'

বিকেল তিনটা থেকে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে বসে থাকলেন আবিদুর রশিদ। রিপোর্টগুলো সব হলুদ খামে পুরে রেখেছেন হাতে। ডাক্তারের দেখা পাওয়া গেলো তাড়াতাড়িই। আজ তিনি এসেছেন একা, মেয়েকে সঙ্গে আনেননি।

ডাক্তার রিপোর্টগুলো আবার দেখলেন, তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে এলো। মাথা না তুলে তিনি বললেন, 'আপনি মেয়ের কে হন?'

'বাবা।'

'সঙ্গে আর কেউ এসেছে?'

'না।'

'শুনুন। মেয়েকে খুব তাড়াতাড়ি ভর্তি করান। হাসপাতালে বা ক্লিনিকে। আমাদের ক্লিনিকে করাতে পারেন।'

'কবে ভর্তি করাতে হবে?'

'যতো তাড়াতাড়ি পারেন। একটা অপারেশন করতে হবে?'

'অপারেশন?'

'হ্যাঁ।'

'অপারেশন না করালে হয় না?'

'না।'

'রোগের নাম কি জানতে পারি?'

'জ্বী। পারেন। ওভারিয়ান টিউমার।'

'টিউমার?'

'হ্যাঁ। ক্যান্সারও হতে পারে। লক্ষণ সে রকমই। নিজেকে শক্ত রাখুন। মেয়েকেও শক্ত করে তুলুন।'

'মেয়েকে কি জানাবো ওর এই অসুখের কথা?'

'শুনুন। পেশেন্টের অধিকার আছে তার রোগের নাম জানার। আপাততঃ যেটা সারটেইন, সেটাই জানুক সে। ওভারিয়ান টিউমার। ওপারেশনের পরে বায়াপসি করলে জানা যাবে ম্যালিগন্যান্ট না ননম্যালিগন্যান্ট। ইভেন দ্যাট, হোপ ফর দি বেস্ট এন্ড বি প্রিপেয়ারড্ ফর দি ওর্স্ট।'

'জ্বী আচ্ছা।'

'আমাদের ক্লিনিকে ভর্তি করাতে হলে কতো টাকা লাগবে, সব জানতে পারবেন এই ঠিকানায়। আপনার মেয়ে যেন কোথায় পড়ে বলেছিলেন ?'

'বুয়েটে। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ।'

'খুবই ট্যালেন্টেড মেয়ে আপনার। ওর প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আপনি ওকে ক্লিনিকেই ভর্তি করান। আরো দুজন স্পেশালিস্টকে আমরা তাহলে অপারেশনের সময় পাশে পাবো।'

'জ্বী আচ্ছা। দু'তিন দিন পরে ভর্তি করালে অসুবিধা আছে ?

'না। দু তিন দিনের বেশি দেরি করবেন না। জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়াই ভালো।'

আবিদুর রশিদ বেরিয়ে এলেন ডাক্তারের চেম্বার থেকে। দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন সমস্ত বোধ। কী হবে এখন ? যদি ক্যান্সারই হয়? টিউমার আর ক্যান্সারের পার্থক্য কী? অপারেশনের জন্য অজ্ঞান করার পর জ্ঞান যদি না ফেরে ? কতো টাকা লাগবে? টাকা পাবেন কোথায় ? ব্যাংকে আছে হাজার ছয়েক; সেটা তুলতে হবে; কিন্তু তাতে কী আর সার্জনদের চার্জ উঠবে ? হয়তো ক্লিনিকের বেডের ভাড়া দেয়া যাবে। ওষুধ,পথ্য — খরচ কি কম ?

ক্লিনিকটার ঠিকানা দেখে রওনা দিলেন তার উদ্দেশে। ধানমন্ডিতে ক্লিনিক। রিক্শায় চড়ে পৌঁছলেন।

ম্যানেজার বললো, 'খরচ বেশি না। তিন চার দিন থাকতে হবে। প্রতিদিন একহাজার টাকা করে তিনচার হাজার টাকা। আর অপারেশন চার্জ কুড়ি হাজার। এর বাইরে আরো কিছু লাগতে পারে। হাতে রাখা ভালো।'

পঁচিশ হাজার টাকা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি। কে দেবে ? হাত পাতবেন অন্যের কাছে, ধার চাইবেন। কে দেবে ধার? এ শহরে কে আছে তার বন্ধু, স্বজন? একটা উপায়

আছে, পিসিটা ফেরত দেয়া। শুভ্র আছে, ও নিশ্চয়ই ফেরতের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু মেয়ের চোখের সামনে সেটা করবেন কী করে? মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন তিনি, আগে মেয়েকে ভর্তি করাতে হবে ক্লিনিকে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই টাকা যোগাড় হবে। নিশ্চয়ই। পারাপার স্টোর থেকে আসতে পারে পঁচিশ হাজার টাকা। এর আগে যখন ম্যানেজার ছিল সোহাগ, তখন কোনো কোনো দিন এমন বিক্রিও হয়েছে। বড়োলোকের দাফন-কাফনের সবকিছুর কন্ট্রাক্ট। লাভই টিকেছে বিশ-বাইশ হাজার টাকা।

কলিংবেল বেজে উঠলো, বিছানায় শুয়ে থাকা খুকু বললো, 'বাবু দেখ তো বাবা বোধ হয় এলেন।'

বাবু এসে বললো, 'হ্যাঁ,বাবা।'

আবিদুর রশিদ এ-ঘরে এলেন না, নিজের ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন বিছানায়।

হাসনা বেগম গেলেন সে ঘরে, জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার কী বললো ?'

আবিদুর রশিদ চুপ করে রইলেন।

বাবুদের দাদিও গেলেন সে-ঘরে, উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'সমাচার কী ?'

'নাহ, বোঝা গেলো না', আবিদুর রশিদ যেন শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছেন কথাগুলো,' ডাক্তার বললো ক্লিনিকে ভর্তি করাতে।'

'রোগটা কী?' হাসনা বেগমের জিজ্ঞাসা।

'না, ভালো করে ডাক্তার কিছু বললো না তো,' আবিদুর রশিদ পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেন।

'ভালো করে না বললো, কী বললো, সেটাই বলো', হাসনা বেগম বললেন।

'আহা, যন্ত্রণা করো কেন?' —আবিদুর রশিদ বললেন বিরক্তির সুরে।

হাসনা বেগম কেঁদে ফেললেন, 'আমাকে বলবে কেন, এই সংসারে আমি কে?'

বাবু-খুকুর দাদি ছেলেকে বললেন, 'এর মধ্যে যন্ত্রণার কী হলো, ডাক্তার কী বললো, মেয়ের মা জানবে না।'

হাসনা বেগমের কান্না দমকে দমকে উঠলো, মেয়ের করুণ মুখ মনে পড়ে সেই কান্না গেলো বেড়ে।

বাবু এসে বললো,'বাবা, আপা তোমাকে ডাকে।'

'হাত-মুখ ধুয়ে আসি, নানা জায়গায় গিয়েছিলাম', আবিদুর রশিদ সময় নিলেন।

হাত-মুখ ধুয়ে মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন, রুমের মধ্যে এসে মুখ অন্ধকার করে থাকলেন কিছুক্ষণ; রাগ গিয়ে পড়লো হাসনা বেগমের ওপর। মহিলারা কিছু বোঝে না, এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করলেন মনে মনে।

একাই ছিলেন, ভাবনার মধ্যে ডুবে ছিলেন, চোখ দুটো অর্ধমুদ্রিত, কপালে ঠান্ডা হাত পড়ায় বোধ করলেন আরাম। চোখ খুলে দেখতে পেলেন—খুকু।

'বাবা, তোমার শরীরটা কি খারাপ?'

'না,মা, শরীর ঠিক আছে।'

'মন খারাপ ?'

'না না, মন খারাপ নয়।'

'বাবা, আমার জন্যে ডাক্তারখানা- ল্যাবরেটরি দৌড়াদৌড়ি করে তোমার চেহারা হয়ে গেছে কাহিল। কালো হয়ে গেছো বাবা। বেশি করে চা খাও, বাবুর থিয়োরি। বাবু বলে চা খেলে রং ফর্সা হয়। বাবা, এক কাপ চা খাবে ?'

'তুই বোস। আমি বলছি। তুই খাবি ?'

'খাওয়া যায় বাবা।'

খুকু রান্নাঘরে গিয়ে বুয়াকে বললো দু'কাপ চা বানাতে। তারপর দু'কাপ চা ট্রেতে করে নিয়ে গেলো বাবার ঘরে।

গিয়ে দেখলো, বাবার চোখে জল।

খুকু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

তারপর বললো, 'বাবা, তুমি এতো চিন্তা করছো কেন? আমার অসুখ তো দু'দিন পরেই সেরে উঠবে। বাবা, তোমার জন্য কি পৃথিবীতে মানুষের অসুখ-বিসুখও করতে পারবে না! ডাক্তাররা কী খেয়ে বাচঁবে তাহলে। নাও বাবা চা খাও।'

আবিদুর রশিদ চুপ করে রইলেন চায়ের কাপ হাতে।

'বাবা, নিজের মনের কথা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করে চলতে হয়। আমার অসুখটা কী , এখন আমাকে বলো।'

আবিদুর রশিদ মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছেন না।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর তিনি অনির্দিষ্ট শ্রোতাকে বলার মতো করে বললেন, 'মা, তুই ভালো হয়ে উঠবি।'

রাত্রিবেলা আবার ভীষণ ব্যথা হতে লাগলো খুকুর পেটে, প্রায় বেঁহুশের মতো হয়ে পড়লো সে, ট্যাবলেট খাওয়ানো হলো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বমি; এতো কষ্ট পেলো মেয়েটা। বর্ষাকাল, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি, এর মধ্যে চলে গেলো ইলেক্ট্রিসিটি।

ভয়ে বাবু হয়ে গেলো আধাখানা, বারান্দায় গিয়ে ডাকতে লাগলো আল্লাহ্‌কে, আল্লা আমার আপাকে ভালো করে দাও, আল্লা আমার আপাকে ভালো করে দাও।

সকালবেলা আর দেরি না করে স্কুটার ডাকলেন আবিদুর রশিদ। হাসনা বেগমকে বললেন, 'তুমিও তৈরি হয়ে নাও, ক্লিনিকে থাকতে হবে।'

বাবু বললো, 'বাবা, আমিও যাবো।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'পরে যাস। আগে গিয়ে ভর্তি করিয়ে আসি।'

খুকু নিজে উঠে ব্যাগ গোছাতে লাগলো। যেন কিছুই হয়নি।

দাদি দোয়া পড়ে বিড়বিড় করে ফুঁ দিয়ে দিলেন নাতনির মাথায়।

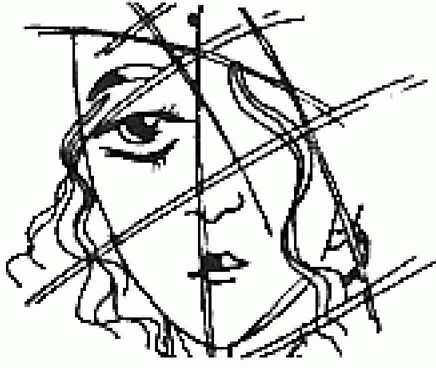
নাতনি উপুড় হয়ে পায়ে সালাম করলো।

বুয়াকে বিশটা টাকা দিলো।

বাবুকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'বিকালে বাবার সঙ্গে বেড়াতে আসিস, ভালোই হলো, তোর বেড়াতে যাবার একটা জায়গা হলো।'

'নে, চুইংগাম খাস, স্মার্ট দেখাবে', বিশ টাকা বের করে ধরলো বাবুর সামনে।

বাবু বললো, 'আমি টাকা নেবো না আপা। সে তার আপার সামনে থেকে দৌড়ে চলে গেলো বারান্দায়। আপার চলে যাবার দৃশ্য সে দেখতে চায় না। তার খুব মনে হতে লাগলো, যাকে ভালোবাসা যায়, সেই মরে যায়। নইলে মিঠু মরলো কেন? তার খুব কান্না পেতে লাগলো, হাউমাউ করে কান্না।



আবিদুর রশিদ মেয়েকে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে বেরিয়ে পড়লেন টাকার ধান্দায়; কিন্তু ঠিক কোথায় গেলে টাকা পাওয়া যাবে কিংবা টাকা পাবার আশায় কোথায় যাওয়া যায়—স্থির করতে পারলেন না। রিক্‌শায় ওঠার পর রিকশাঅলা যখন জানতে চাইলো গন্তব্য, তখন তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'নীলক্ষেত।'

পারাপার স্টোরের সামনে এসে নেমে পড়লেন তিনি।

দোকানে ফোন আছে, বসে বসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফোন করা যাবে। বন্ধুবান্ধব? ঢাকায় কি তাঁর কোনো বন্ধু আছে, বান্ধব আছে? আত্মীয় স্বজন ? তিনি তো কারো কাছে যাননি কখনো, আত্মীয়স্বজনেরা দুএকবার খোঁজখবর নেবার পর হতোদ্যম হয়ে কেটে পড়েছে।

শামীম আহমেদকে অবশ্য ফোন করা যায়। পুরোনো বন্ধু, ইউনিভার্সিটির স্যার সলিমুল্লাহ হলে থাকতেন তারা, একই রুমে। কিছুদিন আগে আবার দেখা হয়েছিলো সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে, তিনি গিয়েছিলেন আকন্দের গাছ খুঁজতে, শামীম জগিং করতে; দেখেই চিনতে পারলো শামীম।

শামীম ছেলেটা ছিলো ভারি মজার; হলের ডাইনিংয়ের ডাল খেয়ে জিভের অবস্থা খারাপ, এ সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করে ফেলেছিলো সে; বকশিবাজার কমিউনিটি সেন্টারে সপ্তাহে দু'দিন সন্ধ্যার পর সে হাজির হতো পাঞ্জাবি-পায়জামা আর কোলাপুরি স্যান্ডেল পরে; শুক্রবার কি রোববার সাপ্তাহিক ছুটি ছিলো তখন, এখন আর মনে পড়ে না; ছুটির দিনে অবশ্যই কোনো না কোনো পার্টি থাকতো; সে সোজা ঢুকে বসে পড়তো ডাইনিং টেবিলে; খেয়ে-দেয়ে কনে দেখে পান চিবুতে চিবুতে চলে আসতো হলে।

শামীম সেদিন তার ভিজিটিং কার্ড দিয়েছে, আবিদুর রশিদ সেটা রেখে দিয়েছেন চশমার খাপের মধ্যে; কার্ডটা পাওয়া গেলো।

মালিককে দোকানে ঢুকতে দেখে আব্দুল হাই ভাবলো এখনই নিশ্চয়ই চলে যাবেন আবিদুর রশিদ।

আবিদুর রশিদ বললেন, 'আব্দুল হাই, একটু বসবো, ফোন করা দরকার।'

শামীম খুব খুশি হলো আবিদুর রশিদের ফোন পেয়ে, বললো, 'রশিদ, তোমার লেখা একটা কবিতা আমার এখনো মনে আছে, আর তোমাকে মনে থাকবে না ? তারপর বলো, কী করতে পারি তোমার জন্যে?'

'শামীম, কী বলবো, খুব বিপদে পড়ে ফোন করছি। তুমি কি কিছু টাকা ধার দিতে পারো, এই ধরো হাজার বিশ পঁচিশেক?'

'এই রে, তুমি গতকাল বললেও পেয়ে যেতে টাকাটা, কাগজঅলাকে কালকে পেমেন্ট করলাম; বোঝোই তো আমার সাপ্লায়ের ব্যবসা; আবার বিল পেলে হাতে টাকা আসবে, অবশ্য চিন্তা নাই, এই মাসেই একটা বিল পাবার কথা আছে। তুমি দিন দশ-পনেরো পরে একবার ফোন করে খোঁজ নিও।'

'ও আচ্ছা। আমার অবশ্য আজকালের মধ্যেই লাগবে। ঠিক আছে। রাখি তাহলে।'

ফোন রেখে আবিদুর রশিদ বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন আব্দুল হাই, বসো; আমি আজ খানিকক্ষণ থাকি দোকানে, বুঝলে, ঢাকা শহরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কে কোথায় আছে মনে করার চেষ্টা করছি, হঠাৎ খুব টাকার দরকার পড়লো।'

গুল্লু বললো, 'পঁচিশ হাজারের কথা কইতেছিলেন না ছার, এইডা একডা ট্যাকা হইলো, একটা বড়োলোক কাস্টোমার আইলে আর পুরা কাম পাইলে আইজ রাইতেই পঁচিশ ত্রিশ হাজার হাতে আইবো।'

ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, গুল্লুর এই কথায় ভেতরে ভেতরে বেশ আরাম পেলেন আবিদুর রশিদ, তিনি ভাবলেন, হ্যাঁ, হতে পারে, আজ রাতেই ত্রিশ/চল্লিশ হাজার টাকা হাতে এসে যেতে পারে; তার দোকানে সে ব্যবস্থা আছে, শেষকৃত্যের প্যাকেজ সার্ভিস; মৃতের দাফন-কাফন, গোসল, কবরখোঁড়া, কবর পাকা করার কাগজপত্র বের করা, কবরের ওপরে নানা আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের স্ট্রাকচার বানানো, কবরে নমফলক উৎকীর্ণ করা — সবকিছুর ব্যবস্থা এই দোকানে আছে। এ সব বুদ্ধিই আগের ছেলেটার, সোহাগের, ছেলেটা শেষপর্যন্ত জাপানে চলে গেলো! ও বলতো, স্যার, আসেন বিজ্ঞাপন দেই, মমতাজ মারা গেছে, শাজাহান যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে; তাজমহল বানানোর দায়িত্ব আমাদের।

'ব্যাপার কী স্যার, আপনাকে কেমন টায়ার্ড টায়ার্ড দেখাচ্ছে', আব্দুল হাই জিজ্ঞেস করলো।

'খুকুর খুব অসুখ, ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে এলাম', জানালেন আবিদুর রশিদ।

গুল্লু মিয়া বললো, 'কন কী স্যার, ছোটো আপার অসুখ, তাইলে তো ছার ট্যাকা-পয়সা দরকার। আর্জেন্ট দরকার।'

একটা পাজেরো গাড়ি এসে থামলো দোকানের সামনে, গুল্লু বললো, 'ছার, বড়োলোকের গাড়ি থামছে, বড়োলোক কাস্টোমার হওনেব চান্স আছে। ইয়া আল্লাহ, য্যান বড়োলোক কাস্টোমার হয়। আল্লাহ, য্যান কাস্টোমার হয়। সারাদিনে একটাও কাস্টোমার নাই।'

এক মধ্যবয়সী লোক আর এক মহিলা ঢুকলেন দোকানে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিত্তবান ঘরের মানুষ; এদের চেকনাই সব সময় আলাদা, মহিলার চোখে কালো চশমা, গায়ে স্লিভলেস ব্লাউস। আব্দুল হাই এগিয়ে গেলো খদ্দেরকে অভ্যর্থনা জানাতে, বললো, 'স্লামালেকুম, আপনাদের কী উপকার করতে পারি?'

'একজনের দাফন-কাফনের কেমন বাজেট লাগে, আপনাদের ধারণা আছে?' আগন্তুক পুরুষটি বললেন।

আব্দুল হাই জবাব দিলো, 'জ্বী আছে। খরচ তেমন বেশি না। তবে জানতে হবে কবর কোথায় দেবেন? পাবলিক গ্রেভইয়ার্ডে, নাকি রিজার্ভ করবেন ? রিজার্ভ করলে ঝামেলা হবে, খরচ বেশি।'

মহিলাটি বললেন, 'না না। ওনার কবরের জায়গা কেনা আছে। এটা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'তাহলে তো খুব লাগবে না,' আব্দুল হাই বললো, 'একটা ভালো কফিন দিয়ে দেই। সেগুন কাঠের। অল বার্মা টিক। একটু কারুকাজ করা থাক। এটা পড়বে চৌদ্দ হাজার। আর কাফনের কাপড়, জাপানি টেট্রন দুই হাজার চারশ, সাবান -আগরবাতি-চাপাতা মিলে একটা সুপারসেট, দেড় হাজার। আমাদের কাছে গোর খোঁড়ার লোক আছে। কবর বাঁধানোর ডিজাইন, মিস্ত্রি—সেসব অবশ্য ধীরে ধীরে করা যাবে।'

'এতো টাকা?' মহিলার কণ্ঠে বিস্ময়।

গুল্লু মিয়া এতোক্ষণ অনেক কষ্টে মুখ বন্ধ করে ছিলো; এবার সে কথা না বলে থাকতে পারলো না, বললো, 'যেমুন মুর্দা তেমুন খরচ, ধরেন আমি মরলে বাঁশের চাটাই বিশ ট্যাকা আর মার্কিন ত্রিশ ট্যাকা। পঞ্চাশ ট্যাকায় ফি আমানিল্লাহ। আর ধরেন আগাখান ইন্তেকাল করলেন। প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে না।'

'না না, সস্তায় সারা যাবে না। আমার একটাই মাত্র শাশুড়ি', ভদ্রমহিলা বললেন।

আব্দুল হাই বেশ দক্ষ সেল্‌সম্যান, বললো,'শাশুড়ি! তাহলে তো খরচপাতি করতেই হবে। আমরা কফিনের গায়ে কবরের মাথায় ঝুলিয়ে দেবো আমাদের স্টোরের নাম—পারাপার স্টোর। বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা থাকবে। ওটা দেখলেই সবাই বুঝবে —না, ছেলে খরচ করেছে মায়ের জন্য। বউমার নাম হবে।'

আগন্তুক পুরুষটি বললেন, 'গুড। আপনাদের কার্ড দিন। টেলিফোন আছে তো? টেলিফোন নাম্বার দেয়া আছে?'

গুল্লুমিয়া সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিলো কার্ড, 'আছে, আছে, এই যে।'

কার্ড দেখে সম্ভবত পছন্দ হলো তাঁর, 'গুড। আপনারা সবকিছু রেডি করে রাখুন, কাল-পরশুর মধ্যেই সব লাগবে।'

'কাল—পরশু ? ডেডবডি কি দেশের বাইরে?' আব্দুল হাইয়ের জিজ্ঞাসা।

'না। আম্মাজান ক্লিনিকে। যখন তখন অবস্থা। ডাক্তার বলেছেন, কাল বা পরশু,' পুরুষটি বললেন।

'ওর মা তো। হাজার হলেও মা ব'লে কথা। বড়ো ভালোবাসে ও মাকে। তাই তো ওর ব্যস্ততার শেষ নেই। কতো জায়গায় ছুটতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো ডাক্তাররা দেখছেন। টাকার দিকে দেখলে তো আর চলবেনা,' মহিলা বললেন।

'তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। তো আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা যদি দিতেন, আমরা খোঁজ পেলেই হাজির হতে পারতাম। একটা কার্ড,' আব্দুল হাই বললো বিনয়ের সঙ্গে।

ভদ্রলোক কার্ড বের করে দিলেন।

'চলো গো, আরো কতো জায়গায় যেতে হবে,' মহিলার তাড়া।

তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। আব্দুল হাই বললো, 'কার্ডটা ভালো করে রেখে দিতে হবে। পার্টি ভালো।'

গুল্লু বললো, 'ভালা মানে ভালা। মালদার। কিছু অ্যাডভান্স কাইটা রাখতে হইতো। অ্যাডভ্যান্স দেওয়া থাকলে কাল-পরশু এই দোকানে আসার ব্যবস্থা ওনারা নিজেরাই কইরা ফালাইতেন।'

আবিদুর রশিদ মাথা নিচু করে চুপচাপ সব কিছু দেখছিলেন এতোক্ষণ ধরে, সত্যি এ দুনিয়া বড়ো বিচিত্র। তারো চেয়ে বিচিত্র হলো মানুষ, মানুষের চরিত্র!

গুল্লু বললো, 'ছার মরবার পরের বেবাক কিছুর সাপ্লাই দেওনের সিস্টেম আমরা রাখছি, ছার, আর একটা সিস্টেম ছার বানাইতে হইবো। মরণের পর বাড়ি গিয়া কান্দনের জন্যে আমরা লোক ভাড়া দিমু। কৌটা ধইরা চোখের পানি জমা হইবো। এক কৌটা চোখের পানি একশ ট্যাকা। নো ফাঁকি। কী কন ছার।'



বাবু ভেবেছিলো আপা নেই, এই সুযোগ, সে এখন সারাক্ষণ কম্পিউটারে খেলতে পারবে। সে অবশ্য নিজে থেকে কোনো দিন কম্পিউটার অন করেনি; কিন্তু ব্যাপারটি

যে কঠিন নয়, সে জানে। সারা বাড়ি ফাঁকা, মা নেই, আপা নেই, বাবা নেই,—বাড়িতে শুধু দাদি, বুয়া আর সে।

প্রথমে সুইচবোর্ডের সুইচটা অন করতে হয়, বাবু সেটা করলো গভীর আস্থার সঙ্গে। এরপর কম্পিউটারের পেছনের সুইচ। সেটা খুঁজে পেতে একটু অসুবিধা হলেও সে পারলো। এবার পর্দায় ঘোলা আলো আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন। মানে কম্পিউটার এবার ডিস্কেট চায়। খেলার ডিস্কেটটা সে চেনে। সেটা খুঁজে ঢুকিয়ে দিলো, কিন্তু কম্পিউটার সেটা উগড়ে দিলো, যেমন করে শিশুরা খাবার উগলে দেয়। পরপর দুবার। ওহো, ডিস্কেটটা তো সে উল্টা করে ঢোকাচ্ছে। তিন বারের বার ঢুকলো।

একা একা কম্পিউটারের সঙ্গে কিছুক্ষণ দাবা খেললো সে। কতোক্ষণ আর খেলা যায়?

দাদিআম্মা ব্যস্ত রান্না ঘরে।

কী করবে এখন সে?

আজ তার স্কুল যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাবা বলেছে, বিকেলবেলা আপার ক্লিনিকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। আপাকে সে কী দেবে?

এক কাজ করা যায়। আপাকে সে একটা চিঠি লিখবে। সে কাগজ-কলম নিয়ে বসলো। লাইন টানা বাংলা খাতার একটা পাতা ছিঁড়লো।

কী বলে যে সম্বোধন করবে? আপা, নাকি খুকু আপা? সে লিখলো, তুমি নাই, বাবা নাই, মা নাই, আমার খুব খারাপ লাগছে। এই পর্যন্ত লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার খুবই কান্না পেলো। কান্নার দমকে লেখা বন্ধ হয়ে গেলো তার।

সে চুপচাপ একা একা ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। তার নিজের জমানো টাকা আছে একশ ছত্রিশ। এর মধ্যে একশ টাকা আছে মায়ের কাছে জমা। ছত্রিশ টাকা এখন তার পকেটে। আর বাংলা খাতার লিখে রাখা একটা টেলিফোন নাম্বার সে টুকে নিয়েছে সঙ্গে করে।

বাবু ঢুকলো পাড়ার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে। বললো, 'একটা ফোন করা যাবে। এই যে নাম্বার।'

দোকানে বসেছিলো এক বিশাল মোটা লোক, সে খুব চিকন গলায় বললো, 'টাকা এনেছো?'

'হ্যাঁ।'

সে নিজেই ডায়াল করে বললো, 'নাও, রিং হচ্ছে।'

ফোনের ওপার থেকে আওয়াজ এলো, 'হ্যালো, জুয়েল বলছি।'

'জুয়েল আইচ ভাইয়া? আমার নাম বাবু।'

' কোন বাবু?'

'ওই যে শুভ্র ভাইয়ার সঙ্গে আমাদের বাসায় এসেছিলেন!'

'ও হ্যাঁ বাবু। বলো। কেমন আছো?'

'আমি ভালো আছি। আমার আপার খুব অসুখ। ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে। জুয়েল আইচ ভাইয়া, আপনি তো অনেক মন্ত্র জানেন। আমার আপাকে ভালো করে দিন না প্লিজ।'

জুয়েল আইচের চোখে ছল ছল করে উঠলো। বাবু কিংবা তার আপাকে তিনি মনে করতে পারেননি, কিন্তু একটা ছোটো ছেলে তার অসুস্থ বোনকে সুস্থ করতে চাইছে, এ ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন ঠিকই। তিনি বললেন, 'বাবু। তুমি চিন্তা করো না, তোমার আপা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।'

'কবে ভালো হবেন?'

' এই তো শিঘ্রি।'

'আপনি কি মন্ত্র পড়েছেন?'

জুয়েল আইচ কখনো মিথ্যা বলেন না, এবারেও বললেন না। তিনি বললেন, ' মন্ত্র পড়তে হবে না। আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, সুস্থ হয়ে নাচতে নাচতে তোমার আপা ফিরে আসছেন।'

বাবু খুশি হলো, থ্যাংক ইউ দিয়ে রেখে দিলো ফোন।

বাবুর মনে হলো, খুকু ফিরে আসবে উচ্চাঙ্গ নৃত্য নাচতে নাচতে। কিছু দিন আগেও খুকু নাচ শিখতো টিভির 'এসো নাচ শিখি' অনুষ্ঠান দেখে দেখে। তেমনি করেই নিশ্চয়ই আসবে খুকু। আইলো দেয়া ঈশানে, সকালে কি বিকালে নাচটা নেচে নেচে।

বাসায় ফিরে দেখলো অবস্থা খারাপ। তাকে বাসায় না দেখে দাদিআম্মা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। আপার জন্যে সে যে কতো বড়ো একটা উপকার করে এলো, সেটা বললো না সে। দাদিআম্মা সোজা তার গালে চড় বসিয়ে দিলেন। বাবু তবু বললো না তার বাইরে যাবার কারণ। ম্যাজিক-ট্যাজিকের কথা গোপন রাখতে হয়। এ-কান ও-কান করলে ম্যাজিকের গুণ যায় নষ্ট হয়ে।

দুপুরে খাওয়া হলো ডিম দিয়ে। 'বাজার করা হয়নি', দাদিআম্মা বললেন। 'এখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ঝামেলা করিসনা বাবু।' খাওয়ার পরে সে দিলো এক বিরাট ঘুম। কাল রাতে তার ঘুম হয়নি।

শুভ্রের জন্যে আজকের দিনটা খুবই তাৎপর্যময়। আজ তার নামে চিঠি এসেছে আমেরিকার নিউ অরলিন্সের এক ইউনিভার্সিটি থেকে; তারা তাকে ভর্তি করার জন্যে নির্বাচন করেছে, জানিয়েছে, সামনের সেপ্টেম্বর থেকে সেশন শুরু, ওখানে যাওয়ার পর একটা টিচিং এসিস্টেন্টশিপও তারা যোগাড় করে দেবে।

এই খবরটা আগে দেয়া দরকার খুকুকে; কিন্তু ওদের বাসায় ফোন নেই; সে ঠিক করেছে, অফিস থেকে বেরিয়ে সে প্রথমেই যাবে ওদের বাসায়।

আচ্ছা, খবরটা পেয়ে খুকু কি খুশি হবে, নাকি মন খারাপ করবে?

খুকুর কথা মনে হতেই ধীরে ধীরে তার মনটাও ঢেকে গেলো কালো মেঘে। খুকুকে ছেড়ে তাকে থাকতে হবে দূর দেশে! কী হবে তাদের জীবনে। খুকুর বুয়েটের কোর্স শেষ হতে হতে কম পক্ষে সাড়ে চার বছর। ওই সময়ে তার এমএস শেষ হয়ে যাবে, হয়তো পিএইচডি-ও। তারপর খুকু যাবে আমেরিকায়? নাকি সেই আসবে? এতোদিন কি সে খুকুকে না দেখে থাকতে পারবে? কক্ষনো না। ছয়মাস পরপর সে ছুটে আসবে দেশে। নিশ্চয়ই আসবে।

খুকুদের বাসায় গিয়ে কলিং বেল টিপলো শুভ্র। দাদিআম্মা খুললেন দরজা।

' তুমি জানো না ভাই, খুকু তো ক্লিনিকে?'

ক্লিনিকের ঠিকানা নিলো শুভ্র। তার মাথা ঘুরছে। গা কাঁপছে। সে নিজেকে বললো, উঁহু, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়।

ক্লিনিকে বাবু গেছে বাবার সঙ্গে। বাবা হাতিরপুল মার্কেট থেকে অনেকগুলো কমলা, আপেল আর একটা হরলিক্সের বয়াম কিনলেন।

বাবু সেইসব রাখলো খুকুর মাথার কাছের টেবিলে।

ক্লিনিকটা তার খুব পছন্দ হলো, সামনে বাগান আছে, আর বেশ পরিষ্কার। পেছনের ব্যালকনি থেকে লেক দেখা যায়।

খুকু বিছানায় আধাশোয়া। সে বললো, 'আয়, এখানে বোস।'

বাবু গিয়ে তার পাশে বসলো।

খুকু বললো, 'বাব্বা, এতো কিছু এনেছিস আমার জন্যে, অসুখ হলে তো খুব লাভ দেখছি।'

বাবু বললো, 'তোমার লাভ, আমার লোকসান। একা একা বাসায় ভালো লাগছে না। দুপুরবেলা ভাত খেয়েছি সেদ্ধ ডিম দিয়ে।'

হাসনা বেগমের চেহারা একেবারেই ভেঙে গেছে, তাকে দেখাচ্ছে ষাট বছরের বুড়ির মতো।

খুকু বললো, 'মা, কমলার খোসা ছাড়াও। বাবুকে কমলা খেতে দাও।'

বাবু গা মোচড়াতে লাগলো। 'কমলা খাবো না আপা।'

শুভ্র এলো এমন সময়। তার হাতে এক বিরাট ফুলের ঝুড়ি। খুকুর মাকে দেখে ফুল নিয়ে ঢুকতে সে লজ্জা পাচ্ছিলো।

শুভ্র খুব মুশকিলে পড়েছে। মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে কী ভাবে সান্ত্বনা দিতে হয়, সাহস দিতে হয়, সে জানে না।

কথা শুরু করলো খুকুই। হেসে বললো, 'কী ব্যাপার। একবারে ফুল নিয়ে?'

শুভ্র আরো সংকুচিত হয়ে গেলো।

'খবর পেলেন কী করে?' মায়ের সামনে খুকু তাকে সম্বোধন করলো আপনি বলে।

'দাদিআম্মার কাছ থেকে জানলাম। কী ব্যাপার, একদম ক্লিনিকে?'

'ব্যাপার কিছু না। ডাক্তার বলেছেন ক্লিনিকে ভর্তি হতে, হয়ে গেলাম। বহুদিন এক বাসায় থাকতে থাকতে অবস্থা খারাপ। তাই হাওয়া বদল করছি?'

হাসনা বেগম বললেন, 'বাথরুমের ফ্লাশটা ঠিকভাবে কাজ করে না। বাবু চলতো, ওদের বলে আসি।' দুজন গেলো বাইরে।

খুকু বললো, 'কাছে এসো। আমার হাতটা হাতের মধ্যে নাও।'

শুভ্র বললো, 'অসুখটা কী?'

খুকু বললো, 'বাবা বলছেন না কী। বাবাকে তো আমি জানি, মিথ্যা করে কোনো অসুখের নাম বলতে পারবেন না, আবার সত্যটাও বলতে পারছেন না। আমার মনে হয় খারাপ কিছু।'

শুভ্র বললো, 'ও রকম সব রোগীরই মনে হয় অসুখটা খারাপ। বাজে কথা বলতে হবে না।'

' না না। সিরিয়াসলি বলছি। আমার মনে হয় ক্যান্সার ট্যান্সার একটা কিছু হবে। আমি সব বুঝতে পারি শুভ্র।'

' তুমি কী বুঝতে পারো?'

'ধরো যেদিন প্রথম তোমাকে দেখলাম, সেই যে তোমাদের অফিসে কম্পিউটার কিনতে গিয়ে, সেদিনই আমি বুঝলাম, এই ছেলের কপালে দুঃখ আছে। এর কপালে আছে এমন একটা মেয়ে যে অচিরেই ভর্তি হবে ক্লিনিকে এবং আর ফিরে যাবে না।'

'প্রথম দিনেই বুঝতে পারলে?'

'হ্যাঁ। কারণ তোমাকে দেখেই আমি বুঝলাম, এ হলো একটা ভালো মানুষ। ভালো মানুষদের নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়।'

'তোমার বোঝাটা ঠিক হয়নি। আমি লোকটা তেমন সুবিধার নই। এটা তুমি আস্তে আস্তে বুঝবে।'

'তারপর আরো আছে। ক্লিনিকের জন্যে বেরুবার আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম প্রথমে ফেলবো ডান পা। কিন্তু দরজা পেরুবার পরই মনে হলো, ভুলে বাঁ পা ফেলে বসে আছি। এর মধ্যে রাস্তায় স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ হলো তিনবার। স্কুটারঅলা বললো, কপালটাই খারাপ।'

'ঠিক আছে। বুয়েটের সেকেন্ড ইয়ারে তোমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তে হবে। পরিসংখ্যান। প্রবাবিলিটি বলে, দুটো পায়ের মধ্যে যে কোনো একটা পা পড়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট। এটা কোনো ব্যাপারই না। আর আমার নিজের স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ঢাকার স্কুটারগুলোর প্রতি কিলোমিটার রাস্তায় স্টার্ট বন্ধ হয় পাঁচবার। এসব নিয়ে তুমি ভাবছো, এটা বেশ বোকামি হচ্ছে। তুমি অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছো। কাকতালীয়

ব্যাপারকে অযথা গুরুত্ব দিচ্ছো।'

'ঠিক আছে। গুরুত্ব দিবো না। একটা ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দাও। একটা কুইজ কইতাম। কাকতালীয় বাগধারাটা এলো কোথা থেকে?'

'না। জানি না তো।'

'একটা কাক ডেকে উঠলো। আর একটা তাল পড়লো গাছ থেকে। কাক ভাবলো—আমার ডাকেই তাল পড়েছে।'

'তা হলেই বোঝো। তোমার ওই সব ঘটনার সঙ্গে অসুখের কোনো সম্পর্ক নেই।'

মা ও বাবু ফিরে আসছেন, শুভ্র সরে বসলো।

খুকু বললো, 'মা, ব্যালকনিতে যাবো। একটু ধরো তো।'

ব্যালকনিটা অপূর্ব। দোতলা। সামনে ধানমন্ডি লেক। আকাশে মেঘ করেছে। বিকেলের মেঘ, নানা বিচিত্র রঙে রঙিন।

খুকু বসে আছে একটা আরাম কেদারায়। তার মাথার কাছে একটা টুলে শুভ্র। কনে দেখা হলদে আলোয় ঢেকে গেলো চরাচর। খুকুর চুল এলোমেলো, রোগে মুখখানা দেখাচ্ছে আরেকটু পাতলা—শুভ্র মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো তাকে। হলুদ আলোয় খুকুকে মনে হচ্ছে সোনার তৈরি মেয়ে, কঙ্কাবতী।

শুভ্র বললো, 'এই আলোকে কী বলে জানো!'

'জানি'– খুকু হাসলো, ম্লান হাসি। তার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল।

আবিদুর রশিদ বসে আছেন ক্লিনিকের নিচতলায়, প্রফেসর সোবহানের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। একটু আগে কথা বলেছেন ম্যানেজারের সঙ্গে।

ম্যানেজার বলেছেন, 'আপনার মেয়ের অপারেশনটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। হেলাফেলা করাটা ঠিক হচ্ছে না।'

'জ্বী, তাড়াতাড়িই করাবো।'

'আমাদের ক্লিনিকের একটা নিয়ম আছে। টাকাটা আগে দিতে হবে। জানেন তো।

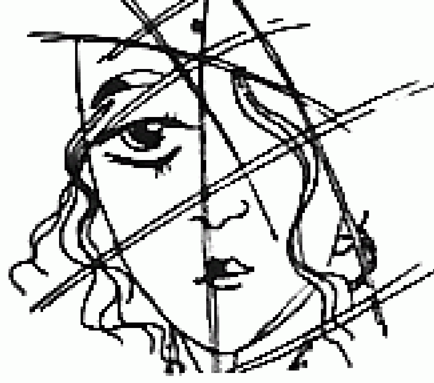
'জ্বী জানি। দিয়ে দেবো। কাল-পরশুর মধ্যে দিয়ে দেবো।'

বলেছেন বটে কাল-পরশু, কিন্তু ব্যাপারটা এখনো ফয়সালা হয়নি। কোথাও থেকে টাকা পয়সা পাবার কোনো আশ্বাস মেলেনি।

প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করলেন আবিদুর রশিদ। তিনি বললেন, 'আপনার মেয়ে ভর্তি করিয়েছেন। গুড।'

'স্যার, অপারেশনটা করতে দেরি হলে কি অসুবিধা হবে? আপাততঃ ওষুধ দিয়ে পরে শরীর শক্ত হলে করলে হয় না!'

প্রফেসর রেগে গেলেন, 'নিজে নিজেই এতো বুঝে ফেললেন। শুনুন, যদি ক্যান্সার হয়, তা হলে ভেতরে কী হচ্ছে জানেন, একটা সেল ভেঙে দুটো, দুটো ভেঙে চারটা, চারটা থেকে আটটা, ষোলটা, বেড়েই চলেছে। ওই বিষের বীজকে যতো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলা যায় তা তোই মঙ্গল।'



রাতে বাবু শুলো দাদির বিছানায়।

বাবু বললো,'দাদিআম্মা, গল্প বলো।'

দাদি বললেন, 'কিসের গল্প?'

বাবু বললো, ' মাসুদ রানার গল্পও করতে পারো।'

'না; মাসুদ রানার গল্প তো বড়োদের গল্প।'

'বড়োদের মানে কী? আমি তো অনেক পড়েছি।'

'তুই কোথা থেকে পড়লি?'

'কেন, তোমার স্টক থেকে।'

'তাহলে তো তুই বড়ো হয়ে গেছিস। আমার সঙ্গে শুতে এসেছিস কেন? ওই বিছানায় শো একা একা।'

'না, ভয় লাগে।'

'ওমা, মাসুদ রানা পড়বি আর ভয়ে একা একটা বিছানায় শুতে পারবি না, এ কী কথা?'

'ঠিক আছে। অন্য গল্প বলো।'

দাদি গল্প বলতে শুরু করলেন। তার ছেলেবেলার গল্প। ছেলেবেলায় তাদের নদীতে একবার কুমির এসেছিলো। তাদের এক চাচা নেমেছেন নদীতে, কুমির ধরলো তাঁর পা কামড়ে। চাচা জানতেন, কুমিরের দুর্বল জায়গা হলো তার চোখ। তিনি প্রাণপণে দুচোখ টিপে ধরলেন কুমিরটার। কুমিরটা তখন পা ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালালো। সেই চাচাকে তারা আগে বলতেন ডেপটি চাচা। পরে তার নাম দেয়া হলো কুমির টেপা চাচা।

বাবু ঘুমিয়ে পড়লো।

আবিদুর রশিদ ফিরলেন অনেক রাতে। ক্লিনিক থেকে তিনি আবার গিয়েছিলেন পারাপার স্টোরে। দিবারাত্র খোলা থাকে ওই দোকান। বেচাবিক্রি যা হলো, তাতে দিনের খরচ চলে যায়; বাড়তি কিছু থাকে না।

তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন রাতে বাবুকে নিয়ে আসবেন নিজের বিছানায়, তা আর করা হলো না।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। এ বিছানায় একা একা তিনি শোন না বহু দিন। হাসনা বেগম তার সংসারে এমনভাবে আছেন, যেন বায়ুসমুদ্র, তার মধ্যেই ডুবে থাকা; কিন্তু তাকে দেখা যায় না। অনুভব করা যায়।

টাকাটা যোগাড় হলো না। ডাক্তাররা তাগাদা দিচ্ছেন।

ব্যর্থ তিনি, এক ব্যর্থ পিতা। সামান্য ক'টা টাকা!

এমন যদি হয়, ওই ভদ্রমহিলার শাশুড়ি মারা যায়, আর তার শেষকৃত্যের কাজটা পারাপার স্টোরেই আসে, তাহলেই তো সহজ সমাধান। কিংবা এ জাতীয় অন্য পাঁচটা কেইস। ঢাকার যতো ব্যাংক ডিফল্টার কোটিপতি আছে, তাদের কেউ মারা গেলে আর বিজনেসটা তার দোকানে এলেই তো এ যাত্রা বেঁচে যান তিনি।

ছি ছি। এসব কী ভাবছেন? অন্যের মৃত্যু কামনা করছেন তিনি! না, কখনো না। কারো মৃত্যুই তাঁর কাম্য নয়। কারো ক্ষতির বিনিময়ে তিনি চান না নিজের বিপদমুক্তি। কারো কান্নার বিনিময়ে চান না নিজের হাসি। ঘরে একটা টিকটিকি ডাকছে টিকটিক। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়তো এখনি বৃষ্টি শুরু হবে।

একটা ছোট্ট নীলপাখি ঢুকে গেলো তাঁর ঘরে। আবিদুর রশিদ বললেন, 'তুমি কে? তোমার ডানার রং এতো নীল কেন?'

পাখিটা জবাব দিলো 'আমি মৃত্যু। তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'সে কী করে হয়। আমি তোমার সঙ্গে গেলে আমার দাফন-কাফন হবে কী করে? পারাপার স্টোরে যে আমার জন্যেও কাফনের কাপড় রেডি করে রাখা হয়েছে। একটা খুব সুন্দর কফিনও বানানো হয়েছে।'

'তুমি আমার সঙ্গে চলো। তা না হলে তো তুমি মরবে না।'

'আচ্ছা। চলো।'

আবিদুর রশিদকে ঢেকে দেয়া হলো শাদা কাফনে। আব্দুল হাই বললো, 'এই মুর্দাটা আসায় আমরা বাঁচলাম। নগদ বিক্রি, নগদ লাভ। এই টাকা দিয়ে চাল কিনবো, ভাত খাবো।'

তাকে শোয়ানো হলো খাটিয়ায়। কতোগুলো লম্বা পাগড়ি পরা লোক খাটিয়াটা তুলে নিলো ঘাড়ে, তারা হাঁটতে লাগলো।

আলো থেকে তারা ঢুকে পড়লো অন্ধকারে। ঘন অন্ধকার। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছুই না।

আবিদুর রশিদের ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি ঘেমে গেছেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, জানালা খোলা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি উঠে বসলেন। খোলা জানালা দিয়ে ঘরে পানি ঢুকছে। জিনিসপত্র ভিজে যাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করা দরকার।

কবরে কোনো জানালা-দরজা নেই। তিনি খুবই ভয় পাচ্ছেন। উঠে এক গ্লাস পানি খাওয়া দরকার।

হাসনা পাশে থাকলে এসব কিছুই তাকে করতে হতো না। একটা মহিলা কতো নীরবে জড়িয়ে থাকতে পারে কতো কিছুর সঙ্গে।

একটা কবিতার পংক্তি তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো, 'মৃত্যু। আশ্চর্য নীলপাখি, দিগন্তহীনা।'পংক্তিটা এসেছে আকাশ থেকে, অনন্ত থেকে; এটা লিখে রাখা দরকার হারিয়ে যাবার আগেই। এ-রকম হয়, হতে পারে; যেমন হতো রাইনের মরিয়া রিলকের ডুয়িনো এলিজি লিখবার সময়; কোলরিজ স্বপ্নে পেয়েছিলেন কুবলা খান তার অর্ধেকটা লেখা হয়ে আছে; অর্ধেকটা তিনি আর মনে করতে পারেননি; সেই যথেষ্ট, আমাদের জন্যে।

বাতি জ্বালিয়ে খাতাটা নিয়ে বসলেন বিছানায়, লিখেলেন–

মৃত্যু হে আশ্চর্য নীলপাখি দিগন্তহীনা
আমার যমজ বোন, অন্তলীনা।

শুভ্র খুবই দুশ্চিন্তায় আছে তার আমেরিকা যাবার খরচাপাতি নিয়ে। লাখ দুয়েক টাকা দরকার; এতো টাকা সে পাবে কোথায়? তার বাবা নেই, মা থাকেন ভাইয়ের কাছে; ভাই সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন, পোস্টিং রাজশাহীতে; অংকের টিচার, টিউশনি করে প্রচুর আয় করেন বটে; কিন্তু সে আর কতো? আমেরিকায় গিয়ে পড়লে তার টাকাপয়সার চিন্তা নেই; কেননা সে টিচিং এসিস্টান্টশিপ পেয়ে যাবে, তাতে তার থাকাপড়া হয়ে যাবে; এমনকি এ-টাকায় অনেকেই থাকে বউ নিয়ে।

এদিকে খুবই বিব্রতকর ব্যাপার হলো, ভাবি সব সময়েই বলে আসছেন, সাধের দেওর, তোমাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেবো আমি, চিন্তা করো না। তার এ কথার পেছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করে, শুভ্র বোঝে; ভাবির ছোটো বোন আছে; এসএসসি পরীক্ষায় তিনবার ফেল করেছে; শোনা যায় ক্লাশ এইটে থাকতে একবার পালিয়েও গিয়েছিলো বিয়ে করবে বলে; শেষে ব্যাপারটা গিয়ে ঠেকলো পুলিশী তৎপরতায়। তান্নি নামের এ মেয়েটি তাকে এ পর্যন্ত তিনটি চিঠিও লিখেছে। একবার ঢাকায় এসে তান্নি তার মেসে হাজির। তারা থাকে মগবাজারে, একটা দোতালা বাসার নিচতলাটা ভাড়া নিয়ে, তিনজন; অন্য দুজনের একজন ইঞ্জিনিয়ার, আরেকজন সাংবাদিক।

শুক্রবার ছিলো সেদিন, সকাল আটটায় দরজায় নক; কাজের ছেলেটা ডাকছে, ভাইজান ওঠেন, গেস্ট আইছে। চোখ রগড়ে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে শুভ্র দেখলো– তান্নি। মহাবিব্রতকর ঘটনা।

'কী, বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি?'

'না না ভেতরে এসো।' পরনের কাপড় চোপড় সামলাতে সামলাতে শুভ্র বললো। 'তুমি একটু বসো, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।' এটাচ্‌ড বাথ, শুভ্র বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানি দিয়ে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলো।

বেরিয়ে এসে দেখলো তান্নি তার বিছানায় শুয়ে আছে, লেপ গায়ে দিয়ে।

শুভ্র পাশে বসলো; 'তুমি হঠাৎ ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'বাহ্ আপনি পাতালে থাকেন নাকি যে আপনার ঠিকানা পাওয়া যাবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আপনার ঠান্ডা লাগছে, আপনি লেপের নিচে বসুন'— তান্নি শুভ্রর হাত ধরে তাকে কাছে টানলো।

শুভ্র বললো, ' কী করছো তান্নি, কাজের ছেলেটা দেখলে আমার মানসম্মান থাকবে না যে?'

'দেখবে না। পর্দা আছে। পর্দার ওই পাশে দরজা আছে। আমি ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছি।

'এসেছো ভালো কথা। বসো। পাগলামি করার দরকার কী? গল্পটল্প করি। নাশতা করেছো?'

'আপনার জন্যে পিঠা নিয়ে এসেছি। ব্যাগের মধ্যে আছে। দিন, ব্যাগটা দিন।'

শুভ্র ব্যাগটা দিতে উঠলো, তার শরীর কাঁপছে। তার একবার মনে হলো ছিটকিনি খুলে বাইরে চলে যায়। আরেক বার মনে হলো লেপের নিচে শুয়ে পড়ে।

চেয়ারের ওপর তাকিয়ে দেখলো তান্নির সোয়েটার আর ওড়না।

শুভ্র বললো, চা খাওয়া দরকার। হানিফ, হানিফ... ...।

সর্বনাশ। এই মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না, কোনো কিছুর বিনিময়ে না, এমনকি যদি তার ইউএসএ যাওয়া না হয়, তবুও না।

এদিকে খুকু অসুস্থ, তাকে জানানো পর্যন্ত যাচ্ছে না তার এডমিশনের ব্যাপারটা।

শুভ্র একটা ফুলদানি কিনলো ইস্টার্ন প্লাজা থেকে; তাজা ফুল কিনলো কিছু, সব গোলাপ।

ফুলদানিটা দেখে খুকু খুব খুশি হলো। প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। ওর হাসিমুখ দেখে খুব ভালো লাগলো শুভ্ররও।

খুকু বললো ,'আমি মনে মনে ভেবেছিলাম তুমি এখনই আসবে, আসার সময় একটা ফুলদানি এনে রাখবে। আমি সেটা রেখে দেবো আমার মাথার কাছে।'

হাসনা বেগম উঠে গেলেন বারান্দায়।

খুকু বললো, 'শুভ্র তুমি আমাকে চিঠি লেখো না কেন!'

শুভ্র বললো, ' বারে, রোজই তো দেখা হয়।'

'হয়, তবু চিঠিতে যা বলা যায়, মুখে তা বলা যায় না।'

খুকু মাথার কাছে তার হাতব্যাগ থেকে একটা চিরকুট বের করলো। তাতে লেখা 'তুমি আসো, আসার সময় নিয়ে এসো একটা ফুলদানি আর কতোগুলো গোলাপ। আমি আমার শিয়রের কাছে রেখে দেবো সেসব।'

শুভ্র বিস্ময়াভিভূত।

খুকু বললো, 'বলো, এটাও কি তোমার কাক-তাল?'

'না, এ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। তুমি চেয়েছো, সেটার এমনি শক্তি যে দূরে থেকেও আমি তা করে ফেলছি। রিমোট কন্ট্রোল।' শুভ্রর মনে হলো, তাদের ক্লাসে আলী আসগর স্যার পড়িয়েছিলেন, আলো গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে চলে; আবার কণাও তরঙ্গ হতে পারে; সে ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের কোষে যে চিন্তাতরঙ্গ, তা কি দূরবর্তী কোনো মস্তিষ্কে গিয়ে অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে না?

খুকু বললো, 'শুভ্র, আমি কিন্তু আগেভাগে বহু কিছু বুঝতে পারি। আমার অসুখটা, আমার মন ডেকে বলছে, খুবই মারাত্মক। সম্ভবতঃ ক্যান্সার। আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না শুভ্র।'

শুভ্র বললো, ' তোমার এ-কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তোমার অসুখটা ক্যান্সার হলে ডাক্তাররা তা বলবেন পরীক্ষা করে। আমরা সবাই সেটা জানতে পারবো। তুমিও জানতে পারবে। আসলে সব রোগীই হাসপাতালে কিংবা ক্লিনিকে এলেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা মনে করতে শুরু করে, এ আসাই শেষ আসা। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই সুস্থ হয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যায়।'

' আমার ক্ষেত্রেও যেন তোমার কথাটা সত্যি হয়। শুভ্র, আমার খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে। খুব।' খুকুর চোখে জল, সে হাত উল্টো করে চোখ মুছে চেষ্টা করছে তা গোপন করার।

শুভ্র বললো, 'তুমি কিন্তু এবার পাগলামি করছো। এ ধরনের কথা বললে বুয়েটের খাতা থেকে তোমার নাম কিন্তু কেটে দেবে। যুক্তিবিরোধী আবেগপ্রবণ কাউকে কিন্তু বুয়েটে নেয়া হয় না।'

খুকু বললো, 'শুভ্র, আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। আমি চাই, এ অনুরোধটা তুমি রাখবে। প্লিজ। বলো রাখবে?'

'নিশ্চয়ই। বলো, কথাটা কী?'

'না, আগে বলো, রাখবো, রাখবো, রাখবো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ রাখবো। কথাটা আগে শুনি।'

'না বলো রাখবো রাখবো রাখবো।'

শুভ্র তাই করলো। যেন সে বাধ্য শিশু। মেয়েদের কাছে ছেলেরা তো শিশুই।

খুকু তার গলা থেকে একটা চিকন চেইন খুললো। বললো, 'এই চেইনটা তুমি তোমার কাছে রেখে দাও। আমি যদি মারা যাই, এটা তুমি দেবে তোমার বউকে। আমার কথা তাকে কিছু বলতে হবে না। এমনি এমনি দেবে। শুভ্র প্লিজ।'

শুভ্র হাত বাড়িয়ে নিলো চেইনটা, বললো, 'আপাততঃ এটা আমার গলায় থাকুক, কালপরশু আমি তোমার জন্যে একটা চেইন এনে হাজির হবো। মালা বদলটা হয়েই থাক। এটা আমি যদি আমার বউকে দিয়ে দিই, তাহলে তো তোমার চেইন হয়ে যাবে দুটো। হোক। টক আর সোনা—ও দুটোতে অরুচি দেখাবে, এমন মেয়ে এ ধরণীতে বেশি নেই।'

মটর সাইকেল চালিয়ে ফেরার সময় শুভ্রর খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো, তার গলায় খুকুর চেইন, এ চেইনটা আবার তান্নিকে দিতে হবে নাতো! কিসের মধ্যে কী? শুভ্র নিজেই নিজেকে ধমকে দিলো; বাইকটা পথের ধারে থামিয়ে হেলমেটটা খুলে ধরলো এক হাতে আর অন্য হাতে গলা থেকে চেইনটা খানিকটা টেনে আনলো মুখের কাছে। শুধু এই নিষ্প্রাণ বস্তুটাকে একটা চুমু দেবার জন্যই সে তাহলে থেমেছিলো মাঝপথে।

আবিদুর রশিদ খুবই মুষড়ে পড়েছেন; টাকাপয়সা যোগাড় করার কোনো কায়দা কানুন তিনি বের করতে পারছেন না। কী করবেন, কোথায় যাবেন—বুঝতে না পেরে তিনি আবার এসে বসলেন পারাপার স্টোরে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে গুল্লু বললো, ' ছার, ভালো মাইনষের এই দুনিয়ায় ভাত নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কুনু ট্যাকা।'

আব্দুল হাই গুল্লুকে ধমক দিলো, স্যারের মন ভালো নেই, এর মধ্যে এতো বকবকানি কি তার ভালো লাগবে?

গুল্লু কিন্তু থামলো না। বললো, 'স্যার, আইজকা আসার সময় রাস্তার সাইডে দেখলাম জোড়া শালিক। দুই শালিক মানে লক্ষণ ভালা। আইজকা ছার কম কইরা চাইরটা লোক মরবোই। দ্যাহেন আইজকা কেমন বেচাটা বেচি।'

আবিদুর রশিদ অসহায় বোধ করলেন। চারটা মৃত্যু? শুভ লক্ষণ? তিনি ঠিক মেলাতে পারলেন না এদুটো ব্যাপারকে। বললেন, 'গুল্লু, দুই শালিক দেখেছো, এটা খুব ভালো কথা, তার মানে আজ সব কিছু যাবে ভালো, আজ মানুষ সুখে থাকবে, মানুষের কল্যাণ হবে; এর মধ্যে আবার মৃত্যুর কথা তুললে কেন?'

গুল্লু বললো, 'ছাররে যে কইছিলাম ভালা মাইনষের ভাত নাই। ঠিকই কইছিলাম। দ্যাহেন দেখি, আমরা বেচি হইলো গিয়া কাফনের কাপড়, মানুষ না মরলে আমরা খামু কী? আপনে তো দোকান দিবেন বন্ধ কইরা, না খায়া মরতে হইবো না গুষ্টি শুদ্ধা?'

আবিদুর রশিদের মনে ভেসে উঠলো খুকুর মুখ; তিনি দেখতে পেলেন খাটিয়া, তাতে সাদা কাফনের কাপড়ে ঢাকা মানুষের শরীর। দীর্ঘ শবমিছিল। শুনতে পেলেন স্বজন হারা মানুষের বিলম্বিত করুণ বিলাপ।

তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'গুল্লু, তোর আপা হসপিটালে।'

গুল্লু ওপর দিকে চেয়ে বললো, 'আপারে আল্লা ভালা কইরা দিবো দেইখেন।'

প্রিয় পাঠক, দেখুন আবিদুর রশিদকে, কী উভয় সংকটেই না তিনি পড়েছেন; একদিকে তিনি চান এ শহর থাক মৃত্যুমুক্ত, মৃত্যুর ফেরেশতা যেন ভুলে থাকে এই পথ; অন্য দিকে দেখুন—তিনিই এসে বসে আছেন পারাপার স্টোরে; কোথায় কে মারা যাবে, দরকার হবে শেষকৃত্যের সামগ্রী, মৃতের স্বজন আসবে এই স্টোরে, দুটো বেচাবিক্রি হবে, তার পকেটে দুটো টাকা আসবে—এ আশায়। কিন্তু দেখুন, সাহস করে যে তিনি এই সত্য কথাটা স্বীকার করবেন, তা নয়; কতো রাখঢাক, কতো সচেতন চেষ্টা নিজের অন্তরের কলুষকে ঢাকবার। তাকে দোষ দেয়া যায় না; এটাকেই তো আমরা বলি সভ্যতা, যে, মানুষ তার আদিমতাকে, নগ্নতাকে, কাম-ক্রোধ-লোভ-স্বার্থপরতাকে ঢেকে রাখে পোশাকের শুভ্র আবরণে; সেই ঢেকে রাখার কাজটা যে যতোটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, তাকেই ততোটা সভ্য, ভব্য, সুচরিত বলে আমরা মান্য করি, গণ্য করি, শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধেয় হতে কে না চায়? মাংসের কতো মশলাদার ঘ্রাণে জিভে জল আসে; ভাব দেখাতে হয়—না, কিছুই তো হয়নি; কতো তীব্র কাম এসে শরীরমনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়, সে সবই আত্মগতভাবে চেপে যেতে হয়; লোভের উরু-ভুরু-শরীর কতো সুপুরুষ যোদ্ধাকে যায় খেয়ে, যতোটা পারা যায়; দমন করতে হয়। লোভ সত্য, সেটা গোপন করার চেষ্টাও মিথ্যা নয়, স্বার্থপরতা সত্য, সেটা দমন করার প্রয়াসও মিথ্যা নয়। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কখনো কখনো জিতে যায় আদিমতা, তারপর ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নিতান্তই দুর্ঘটনা বলে ভাবে মানুষ; ভুলে যেতে যায় সংশ্লিষ্টরা, গোপন করতে চায় সমাজের চোখকানজিভের নাগাল থেকে।

এবার আরেকটা পরীক্ষা আবিদুর রশিদের সামনে। গুল্লু মিয়া এখনো শিশু, সে সত্যের নগ্নতাকে কাপড় পরাতে শেখেনি; গুল্লু বললো, 'ছার, আমি দ্যাখছি, জুতাগুলা উল্টায়া রাখলে বিক্রি বেশি হয়; পরপর তিনদিন গেছে, যেদিন আমাগো জুতাগুলো উল্টায়া রাখি, সেই দিন হেভি বিক্রি হয়। আর যেদিন সোজা কইরা রাখি, সেদিন বিক্রি যায় কইমা।'

'ছার জুতাগুলা উল্টায়া রাখি, দেখবেন ঢাকা শহরে আইজকা পাঁচশো লোক মরবো।'

আবিদুর রশিদ আর্ত বোধ করলেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'না না, কোনো দরকার নেই। মানুষের মৃত্যু আমি চাইনা। এ শহরে প্রতিটি ঘরে থাকুক প্রাণের জোয়ার, হাসি আর আনন্দ। সবাই মেতে থাকুক জীবনের উৎসবে, জীবনের আনন্দে।'

গুল্লু মিয়া বললো, 'আইচ্ছা ঠিক আছে। হাই ভাই, ট্যাকা দ্যান তো, চা কিইনা আনি।'

খানিক পরে আবিদুর রশিদ আর আব্দুল হাইকে চা দিতে দিতে এক ফাঁকে গুল্লু মিয়া তিন জোড়া জুতা রাখলো উল্টিয়ে। 'ছার খেয়াল না করলেই হইলো, এই লোকরে দিয়া ব্যবসা হইতো না'– বিড় বিড় করলো সে।

আবিদুর রশিদের চোখ পড়লো ওল্টানো জুতাগুলোর ওপরে। তিনি কঠিন স্বরে বললেন, 'গুল্লু মিয়া, জুতাগুলো সোজা করে রাখো।

গুল্লু জুতাগুলো সোজা করে রাখলো। তার স্যারের চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, তাঁর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা সে এর আগে কখনো দেখেনি।

রাত দশটার দিকে আবিদুর রশিদ গেলেন ক্লিনিকে। ক্লিনিকের ম্যানেজারের রুমের সামনে তিনি হাঁটলেন দ্রুত আর পা টিপে টিপে, যেন ম্যানেজারের সঙ্গে তার দেখা না হয়ে যায়। দেখা হলেই সর্বনাশ, এই লোক আবার মনে করিয়ে দেবে, ' আপনার মেয়ের অসুখটা কিন্তু ভয়ঙ্কর; অপারেশনটা কালই করে ফেলতে চাই, আপনি এক কাজ করুন, এক দৌড়ে বাসায় যান; টাকাটা নিয়ে আসুন; আমি ডক্টর স্যারদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করছি; কাল সকাল ন'টায় মেয়েকে নেয়া হবে অপারেশন থিয়েটারে।'

দোতালায় উঠলেন, কবাট লাগানো, খুললেন ধীরে ধীরে, শব্দ না করে; একটা সবুজ ডিম লাইট জ্বালানো, খুকু ও হাসনা বেগম দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জুতা খুলে নিঃশব্দে ঢুকলেন তিনি, বসে থাকলেন খুকুর পায়ের কাছে রাখা চেয়ারটিতে, অনেকক্ষণ।

সবুজ আলোয় ঘরটাকে মনে হচ্ছে সমুদ্রের নিচে এক কাচের ঘর, যেন পাতালপুরী, আর ওই যে তার মেয়ে খুকু, ঘুমিয়ে আছে, সবুজ আলোয়, যেন এক ফুটফুটে রাজকন্যা, কে তাকে এভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে;—

সবুজ, সবুজ– আমি ভালোবাসি সবুজ– লোরকার কবিতার ছিন্ন অংশ— নারী, আর ঘুমন্ত নারী এক নয়– সুনীলের পদ্যের টুকরো– চোখের পাপড়ি কতো সুন্দর, আজ আবিষ্কার করতে পারলেন মুদ্রিত চোখের সৌন্দর্য। আত্মজা, নিজেরই অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা, তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। এই মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে, শরীরে অসুখ নিয়ে, তার চিকিৎসা কতো জরুরি, তিনি বাবা, তিনি ক'টা টাকার জন্যে ঠেকিয়ে রেখেছেন তাঁর মেয়ের চিকিৎসা। তাঁর মনে পড়ে যায় শৈশবের স্মৃতি– মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলেন ফুপুর বাড়ি, নৌকায়; আর নদীর অপর পাড়ে প্রস্তুত ছিলো গরুগাড়ি; শুধু এপাড় থেকে দুটো গরু নিয়ে যাবার কথা অন্য পাড়ে; গরু মাত্রেই পাকা সাঁতারু, গরু দুটোকে নামানো হলো নদীজলে, পেছনে তাদের লেজ ধরে রইলো তাদের গাড়িয়াল

আব্বাস চাচা; শীতের নদী; তেমন প্রশস্ত নয়; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিলো চোরা স্রোত— কেউ ভাবতেই পারেনি; গরুদুটো ভেসে চললো স্রোতের টানে ভাটির দিকে, সঙ্গে ভেসে চলেছেন আব্বাস চাচা, কিছুতেই গরু দুটো আর তীরের দিকে আসতে পারছে না; সময় চলে যাচ্ছে, গরুগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; আব্বাস চাচা দম হারিয়ে ফেলেছেন প্রায়; নদীর অন্যপাড়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নাম জপছেন মা; গরুগুলো তীরে উঠতে পারছেনা, তীরে উঠতে পারছেই না।

আবিদুর রশিদ নিঃশব্দে গেলেন খুকুর শিয়রের কাছে; চুপি চুপি একটা আলতো চুমু দিলেন তার কপালে; তারপর নিঃশব্দে ত্যাগ করলেন কক্ষ।

রিকশায় উঠলেন; আকাশে মেঘের টুকরো, তার ফাঁকে উঠেছে চাঁদ, পূর্ণিমা নাকি আজ, মেঘের আড়ালে চাঁদটা ডুবছে আর ভাসছে, রজতরেখা তৈরি হয়েছে মেঘের মুক্ত-আকৃতি সীমানা বরাবর; তার নিচে প্রায় নিঃস্তব্ধ পথ ধরে রিকশায় ফিরছেন আবিদুর রশিদ, তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, বুকে পাথর, কষ্ট!

বাসায় ফিরলেন, দরজা খুললেন বাবু-খুকুর দাদি আম্মা; আবিদুর রশিদের মা; বললেন, 'রশিদ এতো রাত করলি, যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়, ভাত খা।'

'আমার খিদে নেই মা,' বললেন আবিদুর রশিদ।

'না থাকলেও অল্প করে খা'।

'ঠিক আছে, আমি খেয়ে নিচ্ছি, তুমি শুয়ে পড়ো।'

হাতমুখ ধুয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন আবিদুর রশিদ, মা শুতে যাননি। ডাইনিং টেবিলে ভাত সাজিয়ে বসে আছেন।

আবিদুর রশিদ খেতে বসলেন।

'কেমন আছে খুকু?'

'ভালো।'

'কবে রিলিজ করবে?

'দেরি হবে মা। অপারেশন করতে হতে পারে।'

বৃদ্ধা চুপ করে গেলেন, তাঁর মুখে আর রা সরছে না। আবিদুর রশিদ বললেন, 'মা, তুমি আমার মেয়েটার জন্যে একটু দোয়া করো তো! বেশ সমস্যায় আছি মা।'

তাঁর মা বললেন, 'ধৈর্য্য ধর বাবা, ভেঙে পড়িস না। সব কিছু আল্লাহ নিশ্চয়ই ঠিক করে দেবেন।'

আবিদুর রশিদ তাঁর ঘরে একা; শুয়ে পড়লেন বাতি নিভিয়ে; দুশ্চিন্তার নানা জট পেঁচিয়ে যেতে লাগলো তাঁর মাথার মধ্যে। ধৈর্য্য ধর বাবা, ভেঙে পড়িস না'— মায়ের কথা মনে হলো। ভেঙে পড়বো না? ভেঙে পড়বো না? মনে মনে তিনি আবৃত্তি করে চললেন—

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত —
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক;
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা —
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি —
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

আছেন রবীন্দ্রনাথ, আপদে-বিপদে সাহস তিনি, কী সুন্দর বলেছেন- যতোবার মৃত্যুভয়ের মুখোশকে বিশ্বাস করেছেন, ততোবারই হয়েছে অনর্থ পরাজয়। না, এই ভয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। মৃত্যুর নিপুণ শিল্প! সিলভিয়া প্লাথও তো বলেছিলেন মৃত্যুকে শিল্প, বলেছিলেন মারা যাওয়া একটা শিল্প, কিন্তু কতো ভিন্ন অর্থে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন বিপুলভাবে, আর সিলভিয়া প্লাথ? গ্যাসের চুলোয় যখন নিজের মাথাটা ধরে রেখেছিলেন, তখন পাশের ঘরে খেলছিলো তার সন্তানেরা।

আবিদুর রশিদ ঘুমিয়ে পড়লেন; ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে এলো চারদিকের ঢাকা; রাস্তায় রিকশার বিচিত্র শব্দ, গাড়ির হর্ণ আর ভোঁ ভোঁ আওয়াজও এলো থেমে; পাহারাদার আর ডিউটিরত পুলিশেরাও বারান্দায় উঠে পড়লো ঝিমুতে ঝিমুতে; ঝিরঝির করে নেমে এলো বৃষ্টি, নগরে, নিসর্গে; কেবল দূরে একটা বিড়াল উঠলো কেঁদে, ঠিক মানবশিশুর কণ্ঠে, কেন, কে জানে!

আবিদুর রশিদ শুনতে পেলেন, খুকু ডাকছে, 'বাবা, বাবা, তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছো কেন; বাবা, আমাকে বাসায় নিয়ে যাও।'

ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। তিনি উঠে বসলেন; তাঁর খুব পানির তেষ্টা পেয়েছে। ঘড়ি দেখলেন, বারান্দা থেকে এসে বিছানায় পড়া আলোয় — রাত তিনটা। তিনি বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন, গেলেন বারান্দায়; ডাইনিং টেবিলে জগগ্লাস; পানি খেলেন।

বারান্দায় খনিক হাঁটাহাঁটি করলেন, এলেন নিজের ঘরে। সহসা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো রবীন্দ্রনাথ, তিনি উচ্চারণ করে চললেন —

রূপ-নারানের কূলে
  জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
  স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
  আপনার রূপ—

চিনিলাম আপনারে
  আঘাতে আঘাতে
  বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
  সে কখনো করে না বঞ্চনা।

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
  সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
  মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে॥

সত্য কঠিন, সত্য বড়ো কঠিন। এ জগৎটা স্বপ্ন নয়। বাস্তব, নিদারুণ নিষ্করুণ বাস্তব। একদিকে আমার মেয়ের জীবন; অন্যদিকে অন্যান্য মানুষের জীবন—এর মধ্য থেকেই যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে আমাকে; আমি কাকে বেছে নেবো? এ-রকমই যদি হয় এ খেলার দুই পক্ষ; তাহলে! আমি চাই আমার মেয়ে বেঁচে থাক। অন্যের মৃত্যুর বিনিময়ে? যে দম্পতি এসেছিলো পারাপার স্টোরে, সেই যে লোকটি যার মা মৃত্যুশয্যায়, সেই যে মহিলাটি যার শাশুড়ি অন্তিমশয়ানে; হ্যাঁ, সেই ব্যবসাটি যদি পাওয়া যায়, তা হলেই তো এসে যায় বিশ- পঁচিশ হাজার টাকা; এ যাত্রা অপারেশনটা সারা যায় খুকুর।

হে মৃত্যুদূত, হে মউতের ফেরেশতা, আপনি আসুন। খরবদার আপনি যাবেন না আমার মেয়ের কাছে, আপনি যান আমার কাস্টোমারদের ঘরে; আর পারাপার স্টোরের ক্যাশবাক্স ভরে উঠুক টাকায় টাকায়।

পরক্ষণেই আবার বিপরীত ভাবনায় দুলে উঠলেন আবিদুর রশিদ, 'ছি ছি, আমি এসব কী ভাবছি? আমি এসব কী বলছি? মানুষের ক্ষতি? মানুষের মৃত্যু?'

'কেন চাইবো না?' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, যখন কেউ ঘুষ খায়, তখন সে কি জানে না এতে দেশের ক্ষতি, মানুষের ক্ষতি? তবু সে কেন খায়? যখন অস্ত্রাগারে বানানো হয় অস্ত্র, তখন কি মানুষ জানে না—এর একমাত্র পরিণতি মানুষ হত্যা, তবুও কি অস্ত্র বানানো পৃথিবীতে কোনো দিন বন্ধ হয়েছে? ডাক্তার যখন তার চেম্বারে রোগীর ভিড় দেখে খুশি হন, তখন তিনি কি জানেন না– এর আরেকটা মানে দেশে রোগ শোক বৃদ্ধি? আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না; আমি কিছু বুঝি না, বুঝতে চাই না—আমি আমার খুকুকে ফিরে চাই।

আবার দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয় তাঁর বোধ তাঁর চেতনা। ওইটাই আসল কথা, তুমি কিছু জানতে চাইছো না, তুমি কিছু বুঝতে চাইছ না; খোঁড়া সমস্ত যুক্তি তুমি দাঁড় করাচ্ছো! ঘুষখোরকে কেউ তো বলে না, সে ভালো কাজ করছে। বলে না? বলে না? তাহলে এ সমাজে ওরা সবাই ভালো আছে কী করে? একজন সচিবের বেতন কতো? একজন প্রকৌশলীর বৈধ আয় কতো? ওরা কীভাবে সমাজে গাড়ি-বাড়ি শান শওকতের জীবন কাটায়, মানুষ জানে না? তবু ওরাই কি সমাজে ফিতা কাটে না, মালা পরে না?

না, দুর্নীতিবাজদের সাক্ষী মেনে তুমি এ মামলায় জিততে চাইছো আবিদুর রশিদ।

তিনি বোধ করেন অসহায়, ক্লান্ত, পর্যুদস্ত।

হঠাৎ হামেদালি মুখটা মনে পড়ে তাঁর, মনে পড়ে হামেদালির সেই কথা, আর কি দেখা সাক্ষাৎ হবি? হামেদালিরকে যে ওরা মারলো? ওরা কি জানতো না, সারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবন? বাণিজ্য করার এতো বিষয় থাকতে সার নিয়ে কেন মেতে উঠলো ওরা? কেন দেশে প্রচুর সার উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও একশ আশি টাকার সারের দাম ছয়শ সাতশ টাকায় উঠতে উঠতে এক সময় তা দুলর্ভ হয়ে গেলো? আঠারোটি কৃষকের প্রাণের বিনিময়ে কেউ কেউ কি আয় করেনি কোটি কোটি টাকা? তাদের ছেলে-মেয়েরা সুন্দর গাড়িতে করে হেসেখেলে বেড়াচ্ছে না? তাদের বউয়েরা কি গর্বিত হচ্ছে না ভারি গয়নার শব্দে? কেবল কি গুলিতে কৃষকের মৃত্যু? সারসংকট থেকে খাদ্যসংকট দেখাদিলে যে দেশের হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে—এ ভাবনা কি ওদের নিবৃত্ত করতে পেরেছে? এতো বড়ো ঘটনা ঘটে যাবার পর কি সামান্য আত্মপীড়নে বিদ্ধ হয়েছে কেউ? দুঃখপ্রকাশ করেছে কোনো ক্ষমতাবান?

কিংবা শিশুদের প্যারাসিটামল সিরাপে বিষ মিশিয়ে যারা ছেড়েছিলো বাজারে, হত্যা করেছিলো এদেশের শ শ শিশুকে, তাদের কি কোনো শাস্তি হয়েছে? কিংবা এমন কি হয়েছে, কেউ আত্মদংশনে আত্মহত্যা করেছে শিশুহত্যার দায় স্বীকার করে নিয়ে?

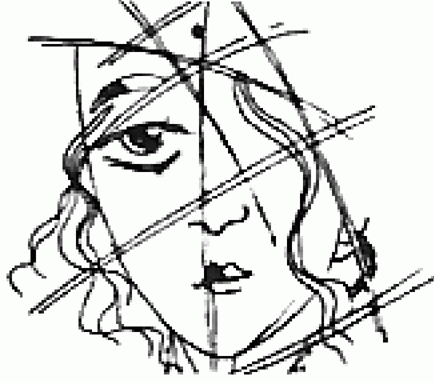
তা হলে আমি কেন এতো ভাবছি, আমি কেন বিদ্ধ হচ্ছি এতো বেশি দ্বন্দ্বে, এতো সব প্রশ্নবাণে, এতো যন্ত্রণায়?

আমি কি সবার মতো নই? আমি কি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো নই?

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রা দোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?

আমিও সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ হতে চাই। সব মানুষের ভিড়ে হতে চাই সুখী মানুষ, সফল মানুষ।

হে মৃত্যুদূত, আপনি আসুন! গুল্লু মিয়া, তুমি জুতোগুলো উল্টিয়ে রাখো, যেন কাস্টোমার আসে। আগরবাতি দাও, ধুপধুনা দাও, যেন বাণিজ্য লক্ষ্মী এসে আসন গেড়ে বসে আমার পারাপার স্টোরে।



খুব ভোরে উঠে পারাপার স্টোরে হাজির হলেন আবিদুর রশিদ। তখন কেবল রাতের পালা শেষ করে কর্মচারীরা চলে গেছে; আব্দুল হাই আর গুল্লু মিয়া শুরু করেছে দিনের ডিউটি। আবিদুর রশিদ নিজের স্যাণ্ডেল জোড়া উল্টিয়ে রাখলেন– গুল্লু অভিজ্ঞ বিক্রেতা; তার কথায় যুক্তি নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে ক্ষতি তো কিছু নেই।

গুল্লু মিয়া একটু পরে খেয়াল করে দেখলো, তার মালিক নিজের স্যাণ্ডেল রেখেছে উল্টিয়ে, সে চুপ করে বসে ওল্টালো অন্য জুতাজোড়াও।

পাঠক, এই ঘটনার কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নেই; কিন্তু দেখুন আমাদের মধ্যবিত্ত রোমান্টিক বাবাকে; তিনি এখন সমর্পিত হয়েছেন নিয়তির কাছে এবং তিনি এখন চাইছেন, সজ্ঞানে যে, তাঁর দোকানে বিক্রি বাড়ুক, মৃত্যুকান্নায় ভারি হোক কোনো ঘর, কোনো উঠোন! এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আপনারা জানেন, আমাদের জীবনের অসংখ্য আপোসের একটা মাত্র।

রিং বেজে উঠলো টেলিফোনে, ফোন তুললো আব্দুল হাই, বললো, 'হ্যাঁ, পারাপার স্টোর, মারা গেছেন, ভোরে, ইন্না লিল্লাহে.....। ঠিক আছে, আমরা এখন রওনা হচ্ছি, হ্যাঁ, আপনাদের কার্ড আমাদের কাছে আছে; কোনো অসুবিধা হবে না; তবে স্যার টাকাটা অগ্রিম লাগবে।'

ফোন রাখলো আব্দুল হাই, বললো, 'ওই বারিধারায় কেইসটা, ভদ্রলোকের মা মারা গেছেন।'

গুল্লু বললো, 'দেখলেন, ছার, সকালবেলাতেই একটা সুখবর কেমন আইসা গেলো। পার্টি মালদার আছে, কবর পাকা করাবার কাজের আগামটাও আজই পাইয়া যাইবেন; দেনা রাইখা কেউ মুর্দা কবরে নামায় না।'

আব্দুল হাই বললো, 'স্যার, গুল্লু থাকলো দোকানে, আমি বের হচ্ছি, লোকজন জিনিসপাতি নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে। পুরো কন্ট্রাক্টই আমাদের।'

দোকানের সামনে ভ্যানঅলারা ঝিমুচ্ছিলো, আব্দুল হাই তাদের তাড়া দিলো, 'ওই মিয়ারা ওঠো, মাল লইতে হইবো।'

বিকেলবেলা আব্দুল হাই টাকা দিয়ে গেছে আবিদুর রশিদকে, টাকা নিয়েই তিনি ছুটে গেছেন ক্লিনিকে, ম্যানেজারের ঘরে।

ম্যানেজার বললেন, 'ঠিক আছে, তা হলে পরশুদিন সকাল ন'টায়।'

আবিদুর রশিদ গেলেন দোতলার কেবিনে। হাসনা বেগমকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'শোনো, খুকুর একটা অপারেশন করতে হবে। ডাক্তাররা ঠিক করেছেন, পরশুদিন সকাল সকাল ন'টায়।'

'মনটা শক্ত করো, মেয়েকে সাহস দাও, নিজেই আবার কাঁদতে বসোনা। শোনো, অপারেশন এখন হচ্ছে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়ার মতোন। এক গ্লাস পানি নিয়ে টুপ করে গিলে ফেললেই হলো।'

খুকু বললো, 'বাবা তোমাকে আজ বেশ ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কী?'

আবিদুর রশিদ লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'না, ফ্রেশ আর কী; তোর সার্জারির ডেটটা ফাইনাল করে ফেললাম পরশু দিন ভোরবেলা।' গড় গড় করে বললেন শেষের কথাগুলো।

খুকু হাসলো। 'আমার পেট কাটতে হবে নাকি? দেখো বাবা, পেট কাটতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একটা কথা, পেটের মধ্যে কোন কাঁচি চিমটি রেখে দেয়া চলবে না।'

আবিদুর রশিদ বিব্রত ধরনের হাসি দিলেন।

'হাসির কথা নয় বাবা। খুবই সিরিয়াস কথা। জিজ্ঞেস করো— কেন?'

'কেন?'

'কারণ ধরো আমাকে এয়ারপোর্টে ঢুকতে হবে। বা ধরো প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে হবে। তাহলে আমাকে ঢুকতে হবে মেটাল ডিটেকটর গেটের মধ্য দিয়ে। আমার পেটে যদি ছুরি কাঁচি একটা কিছু থাকে, তাহলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে পি-পি-পি-পি। সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটির লোকজন গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে

আমার দিকে। ভাববে আমি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে আটকে রাখবে, চেক করবে। সে খুব হেনস্থার ব্যাপার হবে বাবা।'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'ঠিক আছে মা, আমি বলে দেবো।'

অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে খুকুর ভয় ভয় লাগলো। অজ্ঞান করার পর যদি আর জ্ঞান না ফেরে। অক্সিজেন দেবার সময় যদি যন্ত্রটা হঠাৎ অকেজো হয়ে যায়। যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। স্ট্রেচারে করে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওটিতে, সে বাবার হাত ধরে রইলো।

শুভ্র দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে, দরজার কাছে এসে চোখে চোখে অভয়বাণী পৌঁছালো খুকুর কাছে। ইলেক্ট্রনিক মেসেজ। রিমোট কন্ট্রোল। শুভ্র ভাবলো।

তিনজন অধ্যাপক এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন খুকুর পাশে। এর মধ্যে একজনের চুল সম্পূর্ণ পাকা, ভ্রু পর্যন্ত সাদা। তিনি হেসে বললেন, 'খুকু, স্বয়ম্বর সভা। তুমি কাকে পছন্দ করবে, দেখো।' এই রসিকতা খুকুর পছন্দ হলো না। বৃদ্ধ মানুষেরা প্রায়ই এ ধরনের কৌতুক করে থাকে। মাথার কাছে একজন বললো, 'তুমি বুয়েটে ভর্তি হয়েছো না? জানো, মেডিকেলের ছেলেরা রাত্রিবেলা বুয়েটের ছেলেদের কী বলে ডাকে?'

'হ্যাঁ। মিস্ত্রি'। খুকু বললো, 'আর বুয়েটস্টুডেন্টরা ডাক্তারদের ডাকে কবিরাজ বলে।'

গল্প করার এক ফাঁকেই এনেসথেশিয়ার ডাক্তার তৎপর হয়ে উঠলেন। মিষ্টি গন্ধ। অচেতন হয়ে পড়লো খুকু।

সার্জিক্যাল অপারেশন হয়ে গেছে। খুকুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। অপরেশন শেষ করে যখন ডাক্তাররা বেরুচ্ছিলেন, বাবু গিয়ে বললো, 'অপারেশন সাকসেসফুল?'

অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তাররা সচরাচর স্নায়বিক চাপে থাকেন, এই ডাক্তারও ছিলেন। তিনি বললেন, 'রোগী সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াবে, দৌড়ঝাঁপ করবে, তারপর তো বোঝা যাবে, অপারেশন সাকসেসফুল! এখনই কী করে বলবো?'

বাবু খুব মন খারাপ করলো; সে টেলিভিশন নাটকে, সিনেমায় দেখেছে রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা এইভাবে প্রশ্ন করে, আর ডাক্তাররা বলে, 'হ্যাঁ খুশির খবর, অপারেশন সাক্‌সেসফুল।'

আধঘন্টা পরে খুকুর জ্ঞান ফিরে এলো, সে অর্ধচেতন অবস্থায় প্রলাপ বকছে। ডাক্তাররা তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

একজন নার্স এসে খবর দিলো, 'আর কোনো চিন্তা নাই, পেশেন্ট সেন্স ফিরে পেয়েছে।'

দাদিআম্মা বললেন, 'শুকর আল হামদুলিল্লাহ।' হাসনা বেগম মনের মধ্যে বল ফিরে পেলেন।

কেবল আবিদুর রশিদ চিন্তায় আছেন। তিনি জানেন, একটা বড়ো পরীক্ষা সামনে।

ক্লিনিকের ম্যানেজারের ঘরে তাঁর ডাক পড়লো। ম্যানেজার বললেন, এই স্পেসিমেনটা দুটো ল্যাবরেটরিতে বায়াপসি করতে দিন। একই স্পেসিমেন দু জায়গায় দেয়া ভালো।

দু'টো কাচের পাত্র। এর মধ্যেই আছে সেই অতিরিক্ত কোষ- যা হতে পারে প্রাণসংহারী।

আবিদুর রশিদ উঠলেন রিক্শায়, তার হাতে দুটো কাচের পাত্র।

খুকু বাসায় এলো তিনদিনের মাথায়। সাতদিনের দিন তাকে আবার যেতে হলো ক্লিনিকে, সেলাই কাটার জন্যে। এর মধ্যে খবর পেয়ে তার হলিক্রস কলেজের বন্ধুরা এসেছে দল বেঁধে, তারা দিয়ে গেছে হরলিক্স, মালটোভা, ভিভার বয়াম চারটা, আঙুর, কমলা, আপেল, পেঁপে, কলা, ডালিম— নানা পদের ফল-ফলান্তি। বর্ষাকালে শীতের ফল যোগাড় করতে তাদের কোথায় কোথায় যেতে হয়েছে – এসব গল্প তারা করলো শতমুখে। কে কোথায় ভর্তি হয়েছে, কে কার সঙ্গে ডেট করছে, কে বাইরে চলে যাচ্ছে— এসব গল্প তারা করলো বিপুল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। এর মধ্যে চাপাস্বরে একজন বললো, 'জুহির খবর জানিস? পেট বেঁধে গিয়েছিলো। পরে ফেলতে হয়েছে। হ্যাঁ। দেখ, কেমন মাথায় কাপড় দিয়ে ক্লাসে আসতো, আর তলে তলে এই।' আরেকজন বললো, 'ওমা, ওসব কাজ তো তলে তলেই হয়। আল্লাহ্ যে ওপরে ওসব কাজ করার যন্ত্র দেন নাই । হি হি হি হি ।'

আবিদুর রশিদ দুটো ল্যাবরেটরি থেকেই বায়াপসির রিপোর্ট নিলেন, খামবন্দি রিপোর্ট। কিন্তু তার সাহস হলো না খাম খুলে নিজে দেখেন ভেতরে কী আছে! তার হাতপা কাঁপতে লাগলো।

বিকেলে তিনি গেলেন ক্লিনিকে। ডাক্তার সোবহান বললেন, 'আল্লাহর কাছে শোকর করুন। টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ।'

আবিদুর রশিদ হতচকিত, রেজাল্ট নেগেটিভ মানে কী? তা হলে আবার শোকর করতে বলা হচ্ছে কেন?

'মানে কী' — অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মানে টিউমার টিসুটা ননম্যালিগন্যান্ট। আপনার মেয়ের ক্যান্সার নয়। টিউমারটাতো ফেলে দেয়া হয়েছে। আর কোনো চিন্তা নেই। ইনশাআল্লা।'

খুকু এখন বেশ সুস্থ। একা একা চলাচল করছে, ডাইনিং টেবিলে সবার সঙ্গে বসে খাচ্ছে-দাচ্ছে। তার জন্যে রোজ বরাদ্দ হয়েছে এক বাটি করে চিকেন স্যুপ। বাবু তার

দিকে ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে ইতিমধ্যে বলেই ফেলেছে, 'আহারে আমার যদি ওভারিয়ান টিউমার হতো।'

সে কথা শুনে খুকু প্রায় পনেরো মিনিট হেসেছে একটানা; কী কারণে এই দীর্ঘ হাসি — বাবু অবশ্য বুঝতে পারেনি।

শুভ্র এখনো তার আমেরিকা যাওয়ার খবরটা খুকুকে দিতে পারেনি। খুকুর জন্যে সে একটা ভারি গলার চেইন বানাতে দিয়েছে। সেটা অবশ্য এখনো তোলা হয়নি।

তার আমেরিকা যাবার খরচটা কে দেবে তাও এখনো স্থির হয়নি।



আবিদুর রশিদ ইদানীং আরো বেশিমাত্রায় উদাসীন হয়ে পড়েছেন।

পারাপার স্টোরে গিয়ে তিনি সেই ভদ্রলোকের ঠিকানা বের করলেন, যার মায়ের শেষকৃত্যের কাজ পেয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠান। ফুলের দোকানে দিয়ে ফুল কিনলেন একতোড়া।

স্কুটারে চেপে তিনি পৌঁছালেন সেই বাড়িটায়। বাড়ি খুঁজে পেতে সামান্য কষ্ট হলো। বড়োলোকদের এলাকা, পাশের বাড়িতে কে মারা গেছে — কেউ খোঁজ রাখে না। মড়ার বাড়ি বললেও কেউ তাই চিনিয়ে দিতে পারলো না। নাম্বার দেখে দেখে খুঁজে পেতে বের করতে হলো বাড়িটা।

বাড়ির দারোয়ানকে বললেন, 'কবরটা কোথায়? আমি পারাপার স্টোর থেকে এসেছি।'

দারোয়ান নিয়ে গেলো বাড়ির পেছনে, একটা সদ্য নির্মিত কবর; আবিদুর রশিদ সেই কবরের ওপরে রাখলেন এক গোছা ফুল।

তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগলো।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'মরহুমা আপনার কে হয়?'

আবিদুর রশিদ বললেন, 'কেউ না। ওনার কাছে আমি একটা অপরাধ করেছি। সেই জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

আবিদুর রশিদ ঠিক করেছেন এবার সত্যি সত্যি ব্যবসাটা বদলাবেন। কিন্তু করি করি করেও ব্যবসার পরিবর্তনটা করা হয়ে উঠছে না। আবার দোকানের ভালোমন্দ বিষয়েও তার উৎসাহীনতা প্রবল। কাজে যাবার নাম করে এখানে ওখানে যান, একা একা ঘুরে বেড়ান।

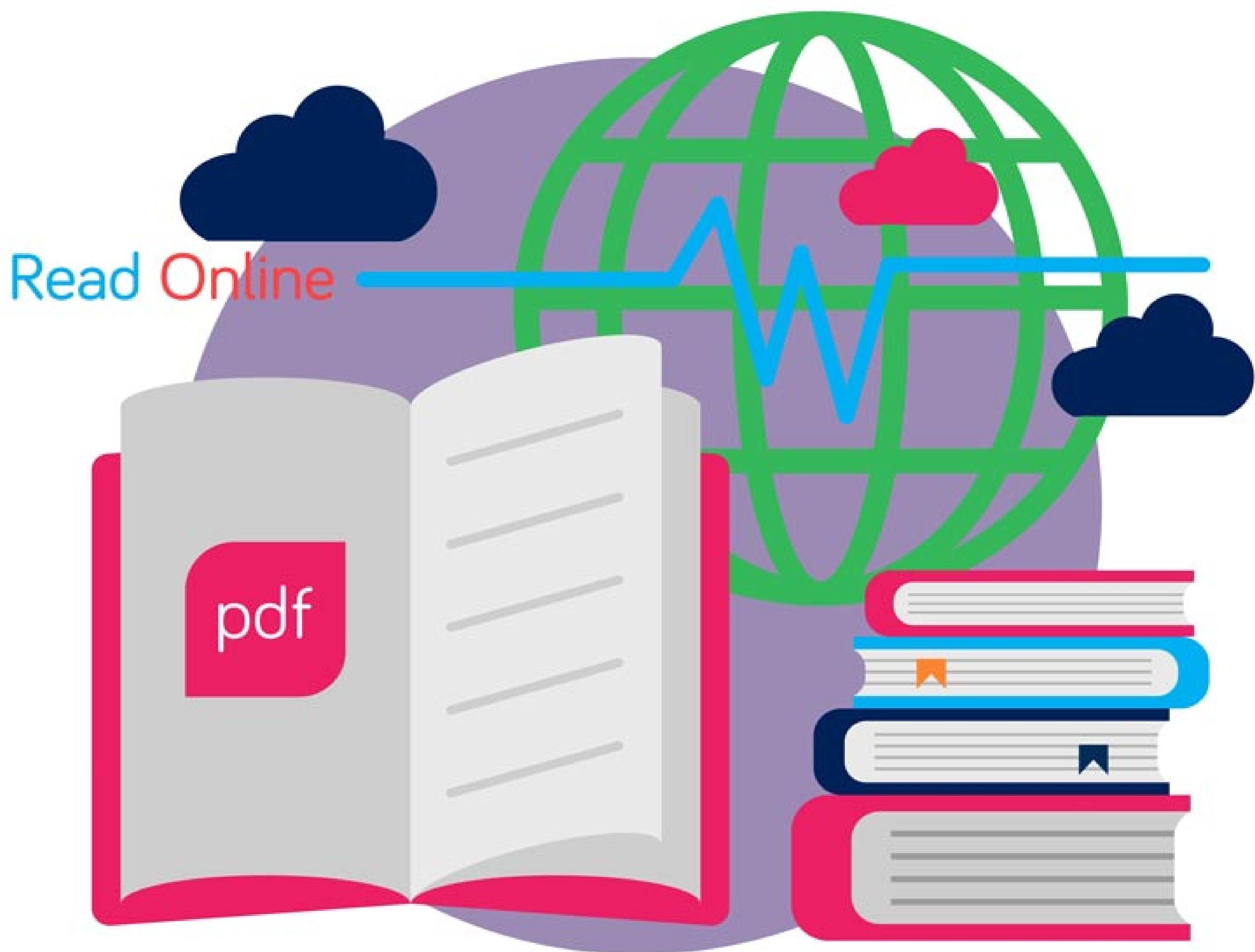
আজ তিনি গেলেন বুড়িগঙ্গা দেখতে। গুলিস্তান পর্যন্ত পৌছতেই তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো। ঢাকা এখন পরিণত হয়েছে যানয[illegible] গুলিস্তান থেকে সদরঘাট যাবার জন্য তিনি চড়লেন ঘোড়ার গাড়িতে। ছ[illegible]ড়া। তিনি ঠিক করলেন খুকু আর বাবুকে একদিন আনতে হবে এখানে। ওরা তো জীবনেও এক্কায় চড়ে নাই– একদিন চড়ুক না!

সদরঘাট থেকে বুড়িগঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে লাগলেন। কতো লঞ্চ, ইস্টিমার। পানি খুবই নোংরা। এর মধ্যে কতোগুলো ডিঙি নৌকাও আছে। হাজার হাজার মানুষকে এপার ওপার করছে।

রোদ পড়ে আসছে। আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে রঙের আস্তর। আরেকটু পর সন্ধ্যা হবে।

আবিদুর রশিদের আবার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা।

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে;
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে ॥


Read Online
pdf